রাজসিক

শ্রীপান্থ

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৪৩

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
সুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবুবিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

ব্লক
নিউ হাফটোন

বাঁধাই
ইউনিয়ন বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

শ্রীমান শান্তি পাল-কে

এই লেখকের :

শ্রীপান্থের কলকাতা

সাত রাণী আট বেগম

॥ সূচীপত্র ॥

তখন নবাগত দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত—তাঁরা সহসা ঠাহর করে উঠতে পারতেন না, এ চলমান হারেম কার। কোম্পানির রেসিডেণ্ট সাহেবের না দিল্লির বাদশার! অক্টরলনীর সমসাময়িক দিল্লির আর এক কমিশনার ফ্রাসার সাহেব ছিলেন এসব ঘরোয়া বিষয়ে আরও পাকা 'নাবব'। তৎকালীন এক ফরাসী ভ্রমণকারী লিখে গেছেন—'দিল্লির আশপাশের গাঁ-গুলোতে যে জনতা, অর্ধেকই তার ফ্রাসারের কৃতিত্ব!' কিন্তু তবুও ফ্রাসার বা অক্টরলনী, বারওয়েল বা হিকি—তাঁরা কেউ এ কাহিনীর নায়ক নয়। কেন না, রাজলক্ষণ শুধু হারেমের আকার ধরে নির্ণীত হয় না—পৌরুষ আরও কিছু কিছু পরিচয়-পত্রের দাবী তোলে।

তাই বলে যেসব ভাগ্যান্বেষী বিদেশী তলোয়ারের খেলা দেখিয়ে পেট চালাতেন, রাজায় রাজায় লড়াইয়ে যাঁরা কশ্চিৎ কখনো আপন পরিচয়ে চোখে পড়তেন—সঠিকভাবে বলতে গেলে ওঁরা ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত সেই ফ্রি-ল্যান্সার মাত্রই নন। তার চেয়ে একটু বেশী, কোমরে খোলা তলোয়ার নিয়ে অনেক বিদেশী এসেছেন এদেশে, ইংরেজ ফরাসী আমেরি-কান-জার্মান স্প্যানিস-হাঙ্গেরিয়ান অনেক ভাগ্যান্বেষী। বেগম সমরুর ডাইনে বাঁয়ে ঠাঁই পেয়েছিলেন তিনজন। সিন্ধিয়ার দরবারে মহীশূরে, হায়দ্রাবাদে, লাহোরে রণজিৎ সিংয়ের দরবারে ছিলেন আরও কয়জন। হায়দ্রাবাদ শহরের এক প্রান্তে সেণ্ট জোসেফ গীর্জার আশেপাশে যে গরীবের বস্তী—তার বাসিন্দাদের কাছে আজও সেই জায়গাটুকুর নাম—'তোপ-কি-সানচা'। ওরা জানে—এক সময় একটা ফাউণ্ড্রি ছিল সেখানে, তোপ তৈরি হত তাতে। কিন্তু কে তা করতেন আর কার জন্যেই বা, সে খবর ওরা বলতে পারবে না! তার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে আরও উত্তরে যেখানে সমতল হঠাৎ ঢেউ খেলেছে, একটা ঢিবি পাহাড়ের ভঙ্গি নিতে নিতে যেন থেমে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে এর নাম 'মইস রাম টেকেডি।' সঙ্গে সঙ্গে সব অর্থ স্পষ্ট হয়ে আসবে, মনে পড়বে বিখ্যাত একজন ফরাসী ভাগ্যা-ন্বেষীর নাম,—ফ্রাঁসোয়া দ্য রমঁন্দ (Francois de Raymond)। নিজাম নাম দিয়েছিলেন তাঁর—'মুসা রহিম'। মুসলমানরা বলতেন—'মুসা রহিম',

॥ অনৈতিহাসিক রাজন্যবর্গের উপাখ্যান ॥

একজন নয়—তিন জন।

ছোটনাগপুরের বনভূমিতে, বাংলার উপকূলে, নর্মদা-গোদাবরীর ডাইনে বাঁয়ে, দিল্লি-আগ্রার পথে পথে, গাঁয়ে গাঁয়ে উপকথার মত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কাহিনীগুলো, কান পেতে তা শুনলে, হয়ত সেই তিন, তিরিশে পৌঁছবে—তিরিশ, তিন হাজারে পল্লবিত হয়ে উঠবে। সে পল্লব-শীর্ষে অচেনা বুনো ফুলের মত থোকে থোকে আশ্চর্য পুষ্প। তাদের অচেনা বর্ণ, অচেনা পরিচয়—কিন্তু পরিচিত গন্ধ, প্রতি পাঁপড়িতে রাজকীয় সৌরভ।

ওঁরা কেউ ভারতীয় ছিলেন না। যে পুরুষটির মৃত্যুর পরে বিরাশীজন মানুষ সগর্বে তাঁর পুত্র বলে দাবী তুলেছিলেন তিনি রাজন্যবর্গ কণ্টকিত ভারত ইতিহাসের কোন বাদশাহ্ নন। যিনি দিল্লির বাদশাহ্ এবং কলকাতার কোম্পানি, দুই রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে নিজেই নিজের টাকশাল বসিয়েছিলেন এবং যে শ্বেতাঙ্গ লর্ড বাহাদুরটি এক অঙ্গে জেমস-হেনরী, তৈমুর-বাবর তথা দিল্লি-লক্ষ্ণৌ কোম্পানি-কাম্বের রক্ত ধারণ করে-ছিলেন—তাঁরাও প্রচলিত অর্থে ভারতীয় ছিলেন না। তাই বলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ইতিহাসে নাম যাঁদের 'নাবব', ওঁরা তাও ছিলেন না। প্রথম পরিচয়, ওঁরা কেউ কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ—কোথাও কোন 'নাবব' কখনও টাকশাল বসিয়ে নিজের টাকা নিজে বানিয়েছেন বলে জানা যায় না। এ দেশের জনতাই ছিল তাঁদের কাছে প্রবাদের 'প্যাগোডা ট্রি'—টাকার গাছ। তাছাড়া অক্টরলনীর মত কোন কোন 'নাবব' তের-পত্নীর হারেমও সাজিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে নিছক দেশাচার অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অক্টরলনীর ত্রয়োদশ-পত্নী যখন তেরটি হাতির পিঠে চড়ে দিল্লির পথে হাওয়া খেতে বের হতেন-

হিন্দুরা—'মুসারাম'। প্রায় কুড়ি বছর একটানা হায়দ্রাবাদের সর্বেশ্বর ছিলেন তিনি। ফিরিঙ্গীবাগানের পরেই আজ যে গাঁ—সেখানে ছিল তাঁর প্রাসাদ। আজ তা নেই, কিন্তু গাঁয়ের নাম এখনও—'মইসরাম'। কিন্তু তবুও 'মুসা-রহিম' এ কাহিনীর নায়ক হতে পারেন না। কেন না, তাঁর জীবন ঘিরে আজ রূপকথার রহস্য নেমে এলেও তিনি ছিলেন নিজাম বাহাদুরের কর্মচারী মাত্র।

একই কথা বিখ্যাত বেনোয়া দ্য বোয়ঁা (Benoit de Boigne) বা পেঁর (Perron) সম্পর্কে। তামাম হিন্দুস্থানে জীবন্ত বিভীষিকা ছিলেন—বোয়ঁা। তাঁর পায়ে পায়ে এক সময় লণ্ডনের শেয়ার বাজার ওঠা-নামা করত, প্যারিসে স্পেকুলেটারদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন সিন্ধিয়ার কর্মচারী মাত্র। তিনি আইরিশ ব্রিগেডের সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাণ্ডার্সদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, রাশিয়ানদের হয়ে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছেন, সেণ্ট পিটার্সবার্গে তিনি ছিলেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রণয়ী, —মাদ্রাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল অন্য এক সহযোদ্ধার পত্নীর সঙ্গে সখ্যতার অভিযোগে। তবুও এমন বর্ণাঢ্য নায়ক হয়েও এ কাহিনীতে বোয়ঁার কোন অধিকার নেই, কেন না মাত্র এক লাখকে চার লক্ষ পাউণ্ড পকেটে নিয়ে তিনি যেখানে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন সে জায়গাটি কলকাতা বা আগ্রা নয়—প্যারিস। পেঁরও তাই করেছিলেন। সঙ্গে অজস্র সোনাদানা এবং মণি মোহরের সঙ্গে দুটি তাম্র-বর্ণের পুত্রকন্যাও ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রি-ল্যান্সারদের কুলচূড়মণি পের্ঁ যেখানে তাঁর ভদ্রাসন নির্দিষ্ট করেছিলেন সেটি সুদূর ফরাসীদেশের অন্তঃপাতী ভেদঁ-র (Vendome) শহরতলী। অথচ শৌর্য বীর্য অর্থকৌলিন্য—সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শ নায়ক। একদা ফ্রান্সের এক মফঃস্বল শহরে পথে পথে রুমাল ফিরি করতেন এই ফরাসী তরুণ। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে যেখানে তিনি পৌঁছেছিলেন তা শুধু তৎকালে পতনোন্মুখ মোগলের বিকল্প ঘর সিন্ধিয়াদের প্রধান সেনাপতির আসনই নয়, অর্থে ইজ্জতে তার চেয়েও বেশি কিছু। সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি হিসেবে মাসে মাইনে

ছিল তাঁর পনের হাজার টাকা, তৎসহ খানাখরচা বাবদ মাসে মাসে আরও কয়েক হাজার টাকা। প্রতি মাসে বত্রিশ হাজার টাকা পেতেন পের" তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের জন্যে। এছাড়াও বার্ষিক তিরিশ লাখ টাকার 'জাইদাদ' ছিল তাঁর,—নিজের প্রাপ্য আদায়ের শতকরা পাঁচ ভাগ! তদুপরি দুই দুইটি সুবার শাসন ক্ষমতা, উত্তর ভারতের জন্যে সিন্ধিয়ার হয়ে টাকা তৈরি—নিমক শুল্ক আদায় ইত্যাদি আরও কিছু কিছু স-রস কর্তব্য ছিল তাঁর। কিন্তু তবুও পেঁর আমাদের এই অনৈতিহাসিক রাজন্যবর্গের কেউ নন। কেননা, তিনি ভৃত্যের মর্যাদা অতিক্রম করতে পারেননি, এবং যেদিন ঘটনাচক্রে সেই স্বাধীনতা তাঁর অধিকারে এসেছিল, সেদিন তিনি পলাতক হিন্দুস্থানী—এদেশের তিনি কেউ না।

সুখ্যাত কাংড়া চিত্রকলার থেকে উঁকি দেয় নতুন রঙ—বর্ণাঢ্য চিত্র আরও রঙিন হয়ে ওঠে। পাহাড়ী নরনারীর জীবনছন্দে জীবন ঢেলে দিয়ে ভেসে বেড়ায়—অচেনা পোশাকে এক আগন্তুক। উৎসাহীরা পরিচয় উদ্ধার করেছেন—হ্যাট-কোটে এ হিন্দুস্থানী আর কেউ নয়, আইরিশ ভাগ্যান্বেষী—ও ব্রিয়েন। রাজা সংসারচাঁদের সংসারে সুজানপুর টিরার সেই স্বপ্নের মত জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন ও ব্রিয়েন। তিনি রাজার মত বাস করতেন, সখীদল পরিবৃত হয়ে রাজার মত হোলি-খেলতেন, —একখানা চিঠি পাঠে সাতদিন সাতরাত্তির সময় নিতেন! যখন তিনি মারা যান, তখন হূণ রাজাদের নিয়মে তাঁর প্রিয় ঘোড়া দুটিকেও কবরস্থ করা হয়। টিরা সুজানপুরে পাহাড়ীদের গাঁয়ের ধারে উপকথার দেশ কাংড়ার লাল মাটিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দুটি ঘোড়া। ও ব্রিয়েন সেখানে লোকের মুখে মুখে বেঁচে আছেন। জর্জিয়ান পোশাকে এখনও যেন তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এই পাহাড়ের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ও ব্রিয়েন তবুও কাংড়ার রাজা নন, তিনি সুজানপুরের বিখ্যাত নরপতি সংসারচাঁদের সেনাপতি, বান্ধব, বয়স্য। কাছাকাছি কাংড়া দুর্গের লরেন্স, যিনি সংসারচাঁদের হারিয়ে যাওয়া কন্যা কানওয়ারকে পেছনের দরজায় ঘরে তুলে নিয়ে ভালবেসেছিলেন—তিনিও ছিলেন

লাহোর দরবারের জনৈক সেনাপতি মাত্র। এলার্ড জেমস সাহেব ফিরিঙ্গী, 'জরুজ সাহেব' বা জর্জ হেসিং, উইলিয়াম লী ওরফে 'মোহম্মদ খাঁ'—এমনি আরও নানা রঙের অনেক ফুল ছিল রঞ্জিৎ সিংয়ের শখের বাগিচায়। কিন্তু অচেনা বনপুষ্পের চমকে চোখ টানলেও তাঁরা কেউ মন টানেন না—এমন করে রাজকীয় সৌরভে হওয়া ছড়ান না।

—'ই-স্‌-কী-নার!'

এখনও যদি আমের আচারের সেই প্রকাণ্ড চীনেমাটির পাত্রটা বিশালপুর, বুন্দেলশর, হানসী বা আলিগড় জেলার কোন গাঁয়ে ইংরেজী হরফের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোন বুড়ো লড়িয়ের নাকের সামনে তুলে ধরা যায়—তবে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠবে তাঁর চোখ। যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—বানানটা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ ঢেউ খেলে যাবে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে। বৃদ্ধ জওয়ানের গলা ফিরে পাবেন, চেঁচিয়ে উঠবেন—ইসকীনার!'—হামারা সিকন্দর সাহেব!

শ্বেত পাথরের গায়ে নয়, কোন স্মৃতি-মন্দিরের মীনারে নয়, ইতিহাসের কোন অধ্যায়ের শীর্ষেও নয়, আমের আচারের একটি পাত্রেই লেখা ছিল হানসীর সিকেন্দরের নাম—'কর্নেল স্কীনার'। লণ্ডনের যে কিউরিওর দোকানে সেটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সম্ভবত ইতিহাসের অমূল্য সব টুকরোর কারবারী সেই দোকানীর কাছে এই মৃৎপাত্রের রহস্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না। তিনি জানতেন না, এই পাত্রটির আসল মালিকানা যাঁর, নাম তাঁর ঈশ্বরী—ঈশুরী খানুম!

কর্নেল জেমস স্কীনার নামে উনবিংশ শতকের অন্যতম দুর্ধর্ষ ইংরেজ লড়িয়ে যদি পাত্রটির স্বত্বাধিকারী হন, তবে স্বয়ং 'সিকেন্দর সাহেবের' মালিকানা ছিল ঈশুরী নামে সেই হিন্দুস্থানী কন্যাটির হাতে, যিনি ধীরে ধীরে এই পাত্রটি হাতে নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতেন, ভ্রূভঙ্গে খানসামা খিদমদগারদের সাজানো ব্যূহ ছারখার করে নিজের হাতে প্লেটে প্লেটে সিকেন্দরের অতি প্রিয় আমের চাটনী পরিবেশন করতেন।

খাওয়ার টেবিলে স্কীনার ছিলেন পরিপূর্ণ মোগল। জেনানাদের প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। কিন্তু ঈশুরী ছিলেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম—সিকেন্দর কোনদিনই তাঁর কাছে 'বাদশা' হতে পারেন নি।

অনেক পরী-ঈশ্বরী ছিলেন সিকেন্দরের চার প্রাসাদে। আলিগড়ের কাছে হানসীতে ছিল তাঁর দরবার তথা রাজধানী। মোগল দরবারের অনুকরণে সেখানে দরবার বসত, স্কীনার তাঁর নিজ রাজ্য তথা জায়গীরের প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ শুনতেন, ফরমান জারী করতেন। সে-সব ফরমানে যে সীলমোহরটি পড়ত, তাতে ফার্সী হরফে লেখা থাকত—'নাসিরউদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কীনার বাহাদুর গালিব জং!' শোনা যায়, এই পদবীটা পেয়েছিলেন তিনি দিল্লির বাদশার মুখ থেকে।

তবে হানসীতে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসে খেয়েছেন—তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন—মোগল সম্রাট মেনে না নিলেও ক্ষতি ছিল না, স্কীনার সত্যিই বাদশা। নাচ-গান-খানাপিনা লেগেই আছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা আসছেন, হিন্দুরা আসছেন, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা আসছেন। গায়ে কাশ্মিরী শাল, মাথায় মুসলমানী টুপি—সিকেন্দর মজলিসে বসেছেন। প্রকাণ্ড হুঁকো থেকে দীর্ঘ সোনালী নল বেয়ে বেনারস থেকে আনা অম্বুরীর ধোঁয়া আসছে, হাওয়া গন্ধে ভরে উঠছে। দূরে এক কোণে বসে হিন্দুস্থানী শিল্পী দরবারী নিয়মে চিত্র কাটছে। সিকেন্দরের কোর্ট পেইন্টারও আছে!

কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী স্কীনারের একটি চিত্র-সংগ্রহ হাতে পেয়েছেন। তাতে একান্নটি চিত্রে স্কীনারের মজলিসের খবর। কারা সেখানে আসতেন, তামাক পোড়াতেন, স্বপ্নের মত সঞ্চয় কুড়িয়ে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরতেন—অনায়াসে তাঁদের চেনা যায়। কানপুরের বৃদ্ধ মৌলবী সালামতউল্লা, বাহাদুর মোকাম, রহিমবক্স; বরোদার রাজা কিষণদাঁদ, জয়পুরের মহারাজা ঈশ্বরী সিং, ফিরোজপুরের নবাব সামসুদ্দিন; হানসীর মীর্জা আজিম বেগ, দেওয়ান বাবুরাম; ওস্তাদ আমীরবক্স তাম্বুরাবাদক···এবং আরও আরও কতজন!

ইউরোপীয়ানরাও আসতেন, কিন্তু ছবিতে তাঁরা নেই। সিকেন্দরের কাছে তাঁর নিজের জগৎ ছিল পুরোপুরি ভারতীয়দের নিয়ে গড়া। বলতে গেলে ইংরেজী প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু গড়গড় করে কথা বলতেন—হিন্দি, উর্দু এবং ফার্সীতে। অতি সম্প্রতি জানা গেছে, সিকেন্দর একখানা আত্মজীবনীও লিখে রেখে গেছেন। এবং সেটি লিখেছেন তিনি ফার্সী ভাষায়। ইংরেজী অনুবাদও একটি আছে অবশ্য কিন্তু সেটি তাঁর নিজের লেখা কিনা বলা শক্ত। কারও কারও অনুমান, সে ভাষ্যটি তাঁর পুত্রদের কারও লিখিত বয়ান।

সিকেন্দরের ভাষা ছিল ফার্সী। আত্মচরিত ছাড়াও তিনি বিস্তর লিখেছেন। ভারতের বিচিত্র জাতি, বিস্ময়কর প্রথাসমূহ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর মনে। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে কাছে ডাকতেন, কৌতূহলী বালকের মত গালে হাত দিয়ে তাদের জীবনের খুঁটিনাটি শুনতেন,—অবসরে সে সব তথ্য পুঁথিতে সাজাতেন। নাসতালিখ হরফে লেখা তাঁর চারশ' বাষট্টি পাতার সেই প্রকাণ্ড পুঁথিটির নাম—'তাস্‌রি-উল-আখবাম' বা 'সংক্ষিপ্ত জনজীবন'। ভারতের নানা জাতির নানা শ্রেণীর মানুষের মেলা সেই বইয়ের মলাটের তলায়। আর একখানা বই ছিল তাঁর 'তাজখিরাত-উল-উমারা'—বা 'রাজন্যবর্গের বিবরণ'। ভারতের সমুদয় রাজার বংশ-বর্ণন থেকে শুরু করে তাঁদের রীতিনীতি, মান-মর্যাদা, শক্তিসামর্থ্য সব ছিল তাতে। মায়, কোন রাজা কয় তোপের সালাম প্রত্যাশা করেন—তাও। বিদেশী হলেও এসব খবর তখন সিকেন্দরের কণ্ঠস্থ। একজন ফরাসী ভ্রমণকারী তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বলেছিলেন, আমি যদি ভারতের প্রধান সেনাপতি হতাম তবে সকলের আগে পরামর্শ করতে ছুটতাম হানসীতে, সিকেন্দর সাহেবের কাছে!

সাহেবরাও আসতেন। তবে পরামর্শ নিতে যত তার চেয়ে বেশী শ্বেতবর্ণের বাদশাকে দেখতে। গায়ে রুপালী জরির কাজ করা নীল কোর্তা, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সিকেন্দর বেরিয়ে পড়লেন। মুতরা, বিলাস-পুর, কাবেরী—হানসীর চারপাশ ঘিরে তার বিস্তীর্ণ রাজ্য, তিনশ' বাটটি

গাঁয়ে অসংখ্য প্রজাবর্গ। তখনকার দিনেই সেই খামারের দাম চৌত্রিশ লক্ষ টাকা। তারপর বিস্তীর্ণ জায়গীর। সিকেন্দর সেখানে ঘুরে বেড়াতেন —প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন, বিচার করতেন, মীমাংসা দিতেন। বলতে গেলে প্রতিটি প্রজাকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। সিকেন্দরের ঘোড়া হানসীর প্রাসাদ থেকে বের হওয়া মাত্র চারদিকে তাঁর আগমন বার্তা রটে যেত, নজরানা নিয়ে প্রজারা দলে দলে এসে তাঁর পথের ধারে দাঁড়াত। সিকেন্দর ঘোড়া থেকে নামতেন, গরিবের ঘরে হাতির পা পড়ত। ফেরার পথে ভোজ আর দানের হিড়িক পড়ত—রাজার সবচেয়ে কামনার ধন জয়ধ্বনি কানে নিয়ে মাসান্তে সিকেন্দর প্রাসাদে ফিরতেন।

হানসী ছাড়াও আরও তিনটি প্রাসাদ ছিল স্কীনারের। একটি ছিল তার বিলাসপুরে, একটি বুন্দেলশরে আর একটি দিল্লিতে—ঠিক কাশ্মিরী গেটের উল্টো দিকে। এই চার মহলেই সিকেন্দরের এক জীবন। নাচ-গান-খানাপিনা-শিকার এবং অতিথি সংবর্ধনা। 'বাদশা'র বাকী সময়-টুকু কী করে কাটত, সে জানে—ঈশ্বরী, সেই আমের চাটনির রহস্যময়ী।

চৌদ্দ-সুন্দরীর অন্তঃপুরে ঈশ্বরী ছাড়া আর কে বা কারা ছিল তা আজ আর জানবার উপায় নেই। সংখ্যাটা আরও বেশী ছিল কি কম, তাও বোঝবার পথ নেই। হিন্দুস্থান রাজবাদশাদের দেশ—এর প্রতিযোগিতা শুধু রাজ্যের আয়তন নিয়েই নয়—অন্তঃপুরের আয়তনেও, এই তথ্যটাও জানতেন বলেই হয়ত সিকেন্দর আসল অঙ্কটা কখনও প্রকাশ করেন নি। বিরাশীজন উত্তরাধিকারী রেখে কৌতূহলীদের চিরকালের মত ধাঁধায় ফেলে রেখে গেছেন।

এই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে স্কীনারের দিল্লির প্রাসাদটির দিকে তাকালে। বিশেষ, মার্বেল পাথরের জেনানা মহলটি দেখলে। পরবর্তীকালে সেখানে অবশ্য হিন্দু কলেজ বসেছিল, এখন নাকি সরকারী অফিস। সুতরাং আজ আর তার দিকে তাকালে কারও সিকেন্দরের কথা মনে পড়বার কথা নয়। একালের দিল্লি বরং তার চেয়ে সহজে চেনে—সেণ্ট

জেমস চার্চ। স্কীনার-প্রতিষ্ঠিত এই গীর্জাটি আজও সেদিনের মতই সমান বিখ্যাত। কিন্তু সেদিনের মত বোধহয় সমান অর্থপূর্ণ নয়। যেমন নয়, তার প্রায় গায়ে গায়েই স্কীনারের প্রাচীন প্রাসাদের দেওয়ালের বাইরের মসজিদটি।

লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন—ফেনি ইডেন, ভেবেছিলেন এটি চার্চ নয়, মসজিদ। মস্ত একখানা মুসলমানী ঢংয়ের গম্বুজ ঘিরে গড়ে উঠেছে চার্চ—গীর্জা। ফেনি লিখেছেন—আমার ভাবতেও ভয় হচ্ছে, 'লিটল বিটস অব ইসলাম উড বি ক্রিপিং ইন!' এটি যে সত্যিই গীর্জা তাই নিয়ে সেদিন রীতিমত সংশয়। কেউ বলেন—এটি আদিতে ছিল মসজিদ। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সিকেন্দর শপথ করেছিলেন, যদি তিনি বেঁচে ওঠেন তাহলে তিনি একটি মসজিদ গড়বেন। কেউ বলেন—প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন তিনি বাবরের মত, পুত্র জোসেফের অসুখ উপলক্ষ্যে। অন্যরা অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে স্কীনার যখন কাশ্মিরী গেটের বিপরীত দিকে এই জমিটা কেনেন তখন সেখানে একটি ভাঙা মসজিদ ছিল। সিকেন্দর তখন নয়া বাদশা হয়েছেন, ধর্মেও তাঁর বাদশাহী বিশ্বাস উঁকি দিয়েছে। তিনি মসজিদ সারাই করবার হুকুম দিলেন। তাই নিয়ে হারেমে ঢেউ জাগল—কক্ষে কক্ষে গুঞ্জন।

ঈশুরী মুসলমানের কন্যা ছিলেন। কিন্তু সকলে তা নয়। চতুর্দশ পরীর মধ্যে যে তিনজনের নাম পাওয়া গেছে তার একজন মান্নু—অন্তত হিন্দুর ঘরের মেয়ে ছিলেন। শোনা যায়, চার্নকের মতই সিকেন্দর তাঁকে 'সতী'র চিতা থেকে কেড়ে এনেছিলেন—ভালবেসেছিলেন। তিনি বেঁকে বসলেন। ঈশুরী, খোয়াজ বক্স এবং অন্যান্য মুসলিম হুরীদের দল এক দিকে; অন্য দিকে মান্নু এবং হিন্দুর ঘরের মেয়েরা—ঘরের সামনেই মসজিদ হতে দেবে কেন তারা? সিকেন্দর বাদশা হলেও তখনও পুরো দিল্লিওয়ালা হননি, যুক্তিটা তাঁর মনে ধরল—তিনি নয়া হুকুম পাঠালেন, মসজিদের সঙ্গে একটি ছোটখাট হিন্দু মন্দিরও হক! আদিতে তাই নাকি ছিল—প্রাসাদের গায়েই ছিল অঙ্গাঙ্গী একটি মসজিদ এবং একটি

মন্দির—সিকেন্দরের আপন ঘরের প্রতীক। পরবর্তীকালে সাহেবদের আনাগোনার ফলে এবং বার্ধক্যবশত যখন আবার ঘরের কথা মনে পড়েছে—তখনই সিকেন্দরের হাতে উঠেছে বাইবেল, মনে পড়েছে যীশুর কথা। সেণ্ট জেমস সেকালেরই ফল। মন্দির-মসজিদ ঘিরেই তাই গড়ে উঠেছে সিকেন্দরের নব ধর্মমন্দির, তাঁর গীর্জাঘর। সম্ভবত সে কারণেই তার অবয়বে এখনও যেন মসজিদের ছায়া, মন্দিরের আদল।

যৌবনে ধর্ম বিশ্বাসে এই অস্থিরতার কারণেই সিকেন্দরের অন্দর আজও তাই এমন অস্পষ্ট। বিরাশীটি পুত্রকন্যার জনক তিনি—কিন্তু তামাম ভারতের কোন গীর্জা ঘরে কর্নেল জেমস স্কীনার নামক কোন প্রটেস্টাণ্ট তরুণের কোন বিয়ের খবর নেই, কোন কাজী বা পুরোহিতও কোনদিন সে কারণে হানসী বা বুন্দেলশর থেকে কোন আহ্বান পেয়েছিলেন, এমন প্রমাণও নেই। সিকেন্দর সে পথের পথিক ছিলেন না। কি ঈশুরী, কি মান্নু—পরিচয়ে তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর—'সহচরী', 'কম্পেনিয়ান'। ফলে, চৌদ্দকে আজ চৌত্রিশে ঠেলে দিলেও বিবাদ বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। ঈশুরীর কবর আছে হানসীতে, মান্নুরও আছে, কেন না পরবর্তী-কালে তিনিও নাকি মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু অন্যদের হিসেব দেবে কে?—হিসেব হবে কী ভাবে?

তবে সংখ্যায় তাঁরা যত অসংখ্যই হোন না কেন, একটা বিষয়ে সবাই নিশ্চিত যে, ঝানু সৈন্যাধ্যক্ষ সিকেন্দরের অন্তঃপুরে বিশৃঙ্খলার কোন স্থান ছিল না। সামরিক কায়দায় সেখানে কোর্ট মার্শাল বসত কিনা, কিংবা মোগলাই বিধানে হানসীর দেওয়ালের আড়ালে তালভঙ্গের অপরাধে কোন রূপসী জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছিলেন কিনা, তা অবশ্য সঠিক বলা যাবে না। তবে এটা ঠিক, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হাইদর হিয়ার্সে'র মত স্কীনার সাহেবের উদরে কোন 'বিশ-পঁচিশের' ছক ছিল না। হিয়ার্সে দক্ষিণের এক খানদানী নবাব-ঘরের কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ নাকি বংশ-নির্বিশেষে এদেশীয় মেয়েদের প্রতি তিনি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। ফলে দেখতে দেখতে বিরাট এক হারেম গড়ে

ওঠে তাঁর অন্তঃপুরে। সেখানে নানা জাতের, নানা বর্ণের, রকমারী মেজাজের রূপসীর কলকল্লোল। সন্ধ্যার পরেই তাঁদের ঘরে ঘরে চাঞ্চল্য, কোথাও দীর্ঘশ্বাস, কোথাও উল্লাস। বিচক্ষণ হিয়ার্সে সেই নৈরাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করলেন। লোক ডাকিয়ে তিনি তাঁর উদরের চামড়ায় বিরাট এক উল্কি আঁকতে আদেশ দিলেন। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। হিয়ার্সে ধীরে ধীরে জানালেন—উল্কিটা ক্রুশ, মেরী মা, কিংবা পরীদের চিত্রও হবে না। তিনি হিন্দুস্থানী মেয়েদের প্রিয় খেলা একটি 'বিশ-পঁচিশের' ছক চান। তাই হল। দুর্ধর্ষ লড়িয়ে বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী হিয়ার্সে নিজের চামড়ায় শান্তির চিরস্থায়ী ঘোষণাপত্র খোদাই করিয়ে অন্তঃপুরে ফিরলেন, কক্ষে কক্ষে হাসি ফুটল, শ্বেতাঙ্গ-বাদশার বিলাসের খবর তুর্কীমোগলের দেশেও প্রবাদ হল। দিকে দিকে খবর রটল, হিয়ার্সে যখন ঘুমোন, তাঁর বেগমেরা তখন পালা করে তাঁর পেটের-ছকে বিশ-পঁচিশ খেলে, ওরা খিলখিল করে হাসে—'বাদশা' নাক ডাকিয়ে সুখে নিদ্রা যান।

সিকেন্দর এ ধরনের বিলাসী ছিলেন না। অন্তত জীবনের বিকেলের দিকে অন্দরে যে তিনি রীতিমত কড়াকড়ি কানুন চালু করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর হারেমে—হিন্দু আর মুসলমানের পাশের ঘরে একটি খ্রীষ্টান মেয়েও ছিলেন। নাম ছিল তাঁর সোফিয়া। সম্ভবত তিনি ছিলেন কোন লাবণ্যময়ী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। একবার সোফিয়ার দুই বোন বেড়াতে এসেছে হানসীতে, বোনের কাছে। যথারীতি স্কীনার সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁদের। এবং সিকেন্দরের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অন্তঃপুরে থাকতে দেওয়া হল তাঁদের। তাঁরা সেখানেই থাকেন।

হয়ত মহলের অভিভাবিকা ঈশ্বরীই নিয়ে এসেছিলেন খবরটা। হঠাৎ একদিন সিকেন্দরের কানে এল তাঁর অন্তঃপুরে নিয়মভঙ্গ হয়েছে। চোরা পথে সেখানে জেমস আনাগোনা ধরেছে,—সোফিয়ার বোন দুটিকে নিয়ে সে প্রমত্ত খেলায় মত্ত হয়েছে। জেমস সিকেন্দরের নিজের পুত্র।

তা হক, তৎক্ষণাৎ পিতার দরবারে তলব পড়ল তাঁর। সেই সঙ্গে মেয়ে দুটিরও।

জেমসের ভীতিবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সিকেন্দর বললেন—জেমস, তুমি রীতি ভঙ্গ করেছ। জেমস মাথা নিচু করল। —জেমস, তুমি অপরাধ স্বীকার করেছ দেখে আমি আনন্দিত।—কিন্তু তবুও এ খেলা আমার জীবৎকালে চলবে না। তোমাকে এক্ষুনি বলতে হবে এই দুটি মেয়ের কোনটিকে তুমি চাও। যদি সে রাজী থাকে, তবে আমি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করব। তোমাকে সারা জীবনের জন্যে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে!

জেমস ধীরে ধীরে তার পছন্দের মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে মেয়েটির নাম ছিল—ফেনি বার্লো। সিকেন্দর বললেন, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরেই তোমাদের বিয়ে হবে। দ্বিতীয় মেয়েটিকে তিনি আদেশ দিলেন—তোমাকে এক্ষুনি প্রাসাদ ছাড়তে হবে।

তারপর ডাক পড়ল স্ত্রী সোফিয়ার। সিকেন্দর ভালবেসেই ঘরে এনেছিলেন তাঁকে। কিন্তু আজ তিনি বিচারকের আসনে বসেছেন এবং এদেশের বাদশাদের ন্যায়নীতির খবরও তিনি কিছু কিছু রাখেন। সুতরাং হানসীর প্রাসাদে একটি নির্মম রায় শোনা গেল। শোনা গেল সিকেন্দর তাঁর বার্দ্ধক্যের সর্বস্বপ্রায়—সোফিয়াকে প্রাসাদ ছাড়তে হুকুম দিয়েছেন। কেন না, তাঁর ধারণা, সোফিয়ার অগোচরে তাঁর বোনেদের নিয়ে কিছুতেই জেমসের অন্তঃপুর-বিলাস সম্ভব হয়নি। যে নারী বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের স্বার্থে খিড়কীর দরজা খোলা রাখতে পারে, সিকেন্দরের প্রাসাদে তাঁর বাস করবার কোন অধিকার নেই। হানসীতেই সোফিয়াকে বাড়ি দেওয়া হল একটা, সেই সঙ্গে কিছু মাসোহারা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি তাই নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেম। জীবনে আর কোনদিন সিকেন্দরের অন্তঃপুরে ফেরা হয়নি তাঁর। অথচ আশ্চর্য এই, স্কীনারের এই অন্তঃপুরে খিড়কীর দরজাই ছিল একমাত্র প্রবেশদ্বার। একটি মেয়েকেও বিয়ে করেননি তিনি।

ফলে জেমস কেন, বিরাশীজন এসে সারি দিয়ে দাঁড়ালেও আইনের চোখে কোন পুত্র সন্তান ছিল না তাঁর। স্কীনার সেটা জানতেন। জানতেন বলেই পাঁচজনকে তিনি কাগজ-পত্রে নিজের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে গিয়েছেন। জেমস তাদের দ্বিতীয়। প্রথম—জোসেফ, দ্বিতীয়—জেমস, তৃতীয়—হারকিউলিস, চতুর্থ—অ্যালেক, পঞ্চম—আলেকজাণ্ডার। এ ছাড়াও কাগজে ও পত্রে দুটি মেয়ের কথা আছে তাঁর। একজনের নাম—এলিজাবেথ, আর একজনের নাম—লুইসা। বাবা তাঁদের দুজনকেই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। উইলে আর তাই তাঁদের কথা ছিল না।

ছেলেদের মধ্যে বড় ছেলে জোসেফ ছিলেন সমসাময়িকদের মতে যথার্থ 'নবাবপুত্র'। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি পোশাক, তেমনি চাল-চালন। ক্লারেট রংয়ের ট্রাউজার, পেটেন্ট লেদারের বুট, সবুজ কোট, সাদা নেকটাই, সোনার বোতাম—জোসেফ তখন দিল্লিতে রীতিমত একজন 'সাহেব'। জনৈক ইংরেজ ললনা লিখছেন—কে বলবে এই ছেলেটি কখনও হিন্দুস্থানের বাইরে পা দেয়নি। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাতের সোনা বাঁধানো মালাক্কা ছড়িটা দিয়ে অনবরতই সে বুটটায় টোকা দিচ্ছে!

দ্বিতীয় ছেলে জেমসের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাবার শাসন যেমন সবচেয়ে বেশী ভোগ করেছে সে, তেমনি বাবার স্নেহও পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। রাজধানী ছেড়ে অন্য কোন দরবারে গেলে সিকেন্দর সঙ্গে নিতেন তাকেই। তৃতীয় পুত্র হারকিউলিসকে পুরো সাহেব করার বাসনায় সিকেন্দর পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। সেখানেই তিনি বিয়ে করেন। ফিরে এসে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। চতুর্থ অ্যালেক বাদশাজাদার মত ঘুরে বেড়াতেন। পঞ্চম আলেকজাণ্ডার ছিলেন সাক্ষাৎ নবাব—দ্বিতীয় সিকেন্দর। নানা দিক থেকে তিনিই বাবার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আলেকজাণ্ডারের পোশাক ছিল মুসলমানী, সংসার—আধা হিন্দুস্থানী, আধা ইউরোপীয়ান। মেয়ে লিনার জন্যে তিনি একটা সোনার কাজ করা খাট গড়িয়েছিলেন, সেটা দোলনার মত ঝোলানো থাকত। লিনা তাতে ঘুমোত, দু'জন সহচরী তা রাতভর দোলাত!

অন্যান্য বিষয়েও বিলাসী ছিলেন আলেকজাণ্ডার। বিশেষ পিতার মতই জনানাদের সম্পর্কে আন্তরিক উৎসাহ ছিল তাঁর। শোনা যায়, প্রিন্স অব ওয়েলস দিল্লি আসার পর আলেকজাণ্ডার নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁকে! প্রিন্স আলেকজাণ্ডারকে তাঁর একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন, দিয়ে বলেছিলেন—কার জন্যে নিশ্চয় তা বুঝতে পারছ। মেয়েটির প্রতি সত্য হয়ো, সমাজ-সম্মত আচরণ করো!

আলেকজাণ্ডার তখন দিল্লিতে একটি বাইজী নিয়ে ঘর করছেন। দিল্লিরই কোন নাচের আসরে মেয়েটি প্রথম চোখে পড়ে তাঁর। সেই রাত্তিরেই নাচ শেষে আলেকজাণ্ডার গোপনে তাঁকে তুলে নিয়ে আসেন নিজের ঘরে। প্রিন্স অব ওয়েলস হিন্দুস্থানী সন্ত ছিলেন না, তবুও তিনি নাকি ব্যথিত হয়েছিলেন, আলেকজাণ্ডারকে বন্দিনীর সম্পর্কে সদয় হতে বলেছিলেন। আলেকজাণ্ডার হয়েও ছিলেন। বিয়ে না করলেও মেয়েটির নাম দিয়েছিলেন তিনি—অ্যানি। এবং আটটি সন্তান দিয়ে ভূষিত করেছিলেন তাকে!

বিরাশীজন এসে কান্নাকাটি জুড়লেও উইলে সিকেন্দার এই পাঁচ সন্তানকেই তাঁর সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম শর্ত ছিল—ছেলেরা কেউ জমিজমা ভাগ করতে পারবে না। হিন্দুস্থানীগেরস্থদের যেমন থাকে, সম্পত্তি তেমনি অখণ্ডই থাকবে,—পাঁচ ভাই মিলে ভোগ করবে। আলেকজাণ্ডার বাবার সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকালে পাতিয়ালা রাজ্যের মাপের সিকেন্দরের রাজত্ব অখণ্ডই ছিল,—দিল্লি, হানসী, বুন্দেলশর এবং বিলাসপুরে প্রাসাদ চারিটিও আপন আপন জায়গায় স্থির ছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প শুরু হল। কোর্টে নোটিশ পড়ল। প্রথম সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন—জেমসের কন্যা, সেই সোফিয়ার বোন ফেনি বার্লোর মেয়ে! তাঁর শাবলের ঘায়ে হানসীর প্রাচীন প্রাসাদে চিড় ধরল। চারদিকের গাঁ আর শহর থেকে দলে দলে বঞ্চিত 'উত্তরাধিকারীরা' এসে আদালতে ভিড় জমাল। দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গেল, প্রাসাদ বিবর্ণ হয়ে এল এবং

একদা হানসীর যে প্রাসাদে নাসির-উদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কীনার বাহাদুর গালিব জং দরবারে বসতেন—যেখানে প্রতিদিন ভোরে বর্শা শীর্ষে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে সিকেন্দরের ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের অধিনায়ককে সালাম জানাত, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় অপ্সরীর হাট বসত, নূপুর নিক্কনে ভোর অবধি রাত্রি জেগে থাকত—দেখতে দেখতে সেই প্রাসাদ নিশাচর পাখির আস্তানায় পরিণত হল। হয়ত আশেপাশের গাঁয়ে এখনও সিকেন্দর বেঁচে আছেন—কোন ভারতীয় চাষীর রক্তে, কোন কারিগরের সবল হাতে—কোন দরিদ্র রমণীর দেহের বর্ণে। কিন্তু তারা নিজেরাও হয়ত আজ তা জানে না। সিকেন্দর তাদের কাছে কোন এক শ্বেতাঙ্গ-বাদশার নাম মাত্র। এমন বাদশা যিনি তাদের সঙ্গে মিশতেন, যিনি তাদের ঘরে বসতেন, তাদের ভালবাসতেন। ক'টি ভাঙা বাড়ি, কিছু স্খলিত ইট কাঠ বরগা, একটি ভাঙা টমটম—ক'টি থাম—আর হাওয়ায় উপকথার মত সেই অদেখা যুগের কিছু কাহিনী, ক'টি ছড়া, কিছু গান, ক'টি রূপক—তাদের কাছে সেই ত সিকেন্দর।

এছাড়া সিকেন্দর সাহেবের অবশেষ আর যা খুঁজে পাওয়া যায়—তা ভারতে এবং বিলেতে ক'টি সাধারণ মানুষ—একটি আমের আচারের পাত্র, আর একটি চামচের কাহিনী।

যতদিন বেঁচেছিলেন, কি হানসী, কি দিল্লি, কি বিলাসপুর—স্কীনারের খাওয়ার টেবিলে প্রতিদিন একটি চামচ দেখা যেত। সোনার নয়, রুপোর নয়—একটি পিতলের চামচ। ঈশ্বরীর হাতের আমের চাটনীর মত স্কীনারের টেবিলে এই চামচ ছিল অপরিহার্য। খেতে বসে যদি হাতের কাছে সিকেন্দর সেটি না পেতেন—তবে ভোজসভা সেদিন পণ্ড—অজ্ঞাত আক্রোশে বালকের মত সব লণ্ডভণ্ড করে উঠে যেতেন জেনারেল। অতিথিরা ভেবে পেতেন না, সামান্য একটা পিতলের চামচ নিয়ে বৃদ্ধ বাদশার কেন এমন বায়না!

সেদিন সেই রহস্যভেদ সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ সে ইতিবৃত্ত সুজ্ঞাত,

অনেকেরই জানা। যাঁরা অষ্টাদশ শতকের ভারতে বিখ্যাত ইংরেজ অভিযাত্রী সিকেন্দরকে চেনেন, তাঁরা জানেন—এই চামচের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর বিচিত্র জীবন-ইতিহাস।

দিল্লিতে তখন জরাগ্রস্ত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিমপর্ব, দক্ষিণে সিন্ধিয়ার যৌবন—কলকাতায় কোম্পানীর কৈশোর। সে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের কথা। কলকাতার পথে পথে তখন ঘুরে বেড়াত একটি ফিরিঙ্গী যুবক। এমন অসহায় ফিরিঙ্গী নেটিভেরা কম দেখেছে। কখনও কখনও সে তাদের কাছেও হাত পাতে। তাদের মোট বয়, ফাই-ফরমাস খাটে। কথাবার্তায় যতখানি বোঝা যায় মনে হয়—তার কেউ নেই, পকেটে চার আনা পয়সা আছে মাত্র।

হঠাৎ একদিন নেটিভদের বাজার থেকে জনাকয় সাহেব এসে ধরে নিয়ে গেল ওকে। নেটিভেরা বুঝতেই পারে না কী ব্যাপার। কেউ ভাবল চোর, কেউ ভাবল ডাকু, কেউ ভাবল পলাতক সেপাই। কিন্তু কেউ ভাবেনি, এই ছেলেটিই একদিন 'বাদশা' হবে, তার নামে হাজার হাজার নেটিভের মুখে জয়ধ্বনি উঠবে।

জেমস নিজেও তা ভাবেনি। কেউ ভাবে না। সেই এলোমেলো যুগে কেউ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবতে পারত না। বাবা পাঠিয়েছিলেন ওকে কলকাতায় একটা ছাপাখানায় শিক্ষানবীশ করে। কথা ছিল সাত বছর সে সেখানে কাজ শিখবে। কিন্তু তিন দিনও ডালহৌসি স্কোয়ারের সেই ছাপাখানা ধরে রাখতে পারল না ওকে। পকেটে চার আনা ছিল তাই নিয়ে জেমস ডালহৌসি স্কোয়ার ছেড়ে নেটিভপাড়ার দিকে পা বাড়াল। মনে মনে বাসনা—জলে ভাসবে, নয়ত কিছুই যদি না হয়, তবে ডুবে মরবে।

কিন্তু তার আগেই সব গোলমাল হয়ে গেল। কে বা কারা এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল।

অবশেষে ওরা যেখানে এসে বগী গাড়িটা থামাল, জেমস অবাক হয়ে দেখল সেখানে দাঁড়িয়ে তার দিদি—মার্গারেট! মার্গারেট ওর মেজদি। আরও দুই বোন ছিল তার—মেরী এবং জেন। দু'জন ভাইও ছিল।

ডেভিড এবং রবার্ট। ডেভিড নাবিক, রবার্ট এখনও বালক মাত্র। মার্গারেট কলকাতায় থাকেন তা তার জানা ছিল, ঠিকানাটাও অজানা ছিল না। কিন্তু কি করে দিদি বাজারের ভিড় থেকে ধরিয়ে আনল তাকে জেমস কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারল না।

স্নান সেরে নতুন পোশাকে খাবার টেবিলে বসে তা জানা গেল। দিদির বাড়ির খিদমদগারটি তাঁর বাপের বাড়ির। জেমসকে সে চেনে। আগের দিন মেমসাহেবের বাজার করতে গিয়ে-সে-ই খবর এনেছিল পলাতক জেমস্-এর।

যাহক ভগ্নীপতি এবার জেমস-এর দায়িত্ব নিলেন। তিনি ওকে নিজের আপিসে কপি করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। জেমস তখন মাতৃহীন অনাথ বালক। তার অভিভাবক—উইলিয়ম বার্ন নামে বাবার এক বন্ধু, তিনিই জেমস-এর ধর্ম-পিতা। বার্ন সৈন্যবাহিনীতে কাজ করেন, বেনারসে থাকেন। ভগ্নিপতি টেম্পলটন বালকের মতিগতি দেখে তাঁকেও খবর পাঠালেন।

এদিকে জেমস উকিলের কাগজ নকল করে আর মনে মনে পালাবার ফন্দী আঁটে। মতলব যখন প্রায় সিদ্ধান্তে এসে ঠেকেছে, এমন সময় বেনারস থেকে এসে পৌঁছলেন বার্ন: জেমসকে তিনি পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি করে বল, তোমার মতলব কী, তুমি কী হতে চাও?

তৎক্ষণাৎ উত্তর হল, লড়িয়ে—এ সোলজার!

বেশ, তবে তাই হবে!

বার্ন ওকে তিনশ' টাকা দিলেন। বললেন, তুমি কানপুরে চলে যাও। এখানে তোমার কিছু হবে না। তোমার বাবার কাছে যাও। গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি আসছি। তারপর ব্যবস্থা একটা হবে নিশ্চয়ই।

—এখানে হবে না কেন? কলকাতা, কোম্পানির রাজধানী। জেমস তাই ভেবে উঠতে পারে না। এখানে কেন তার কোন সম্ভাবনা নেই। তার শরীর ভাল, লেখাপড়ায়ও সে মন্দ ছিল না, তার উপর—গভর্নর জেনারেল, ফোর্ট, এখানেই ত সব।

শুধু এখানে নয়, কানপুরেও হবে না; তরুণের কাছে অতঃপর সত্যটা স্পষ্টভাবেই বলতে মনস্থ করলেন বার্ন—কারণ, তুমি বোধহয় জান, তোমরা ফিরিঙ্গী—হাফ-কাস্ট।

তরুণের চেতনায় যেন চাবুকের ঘা পড়ল। গভীর একটা দাগ তার কলজেটাকে ঘিরে চিরকালের মত একটা বৃত্ত এঁকে দিল। স্কীনার জানলেন—তিনি পুরো সাহেব নন। কোম্পানির সিপাইদের জমকালো কোর্তাটা মুহূর্তে তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে গেল। মনে পড়ল মায়ের কথা। কালো দাগটা যেন আবার সোনালী হয়ে উঠল।

সদ্য-আবিষ্কৃত আত্ম-জীবনীটিতে তিনি ফার্সীতে লিখছেন: আমার বাবা ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী। আদি নিবাস ছিল তাঁর স্কটল্যাণ্ডে। আমার মা ছিলেন রাজপুতানী, বাজীপুরের জায়গীরদারের মেয়ে। চৈৎ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কোম্পানির সিপাই-দের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আমার বাবাও তখন সিপাই। তিনি তাঁর হাতেই পড়েছিলেন। বাবা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে ঘর পেতেছিলেন। আমি আমার দুই ভাই, তিন বোন, আমরা তাঁরই ছেলে-মেয়ে।

স্কীনারের জন্ম তাঁর নিজের হিসেবে ১৭৭৮ সন, এবং তাঁর মায়ের মৃত্যু ১৭৯০ সনে। তিনি লিখছেন: আমার মা স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়েছিলেন। বাবা ঠিক করলেন—আমার বোনদের লেখাপড়া শেখাবেন, তিনি তাদের স্কুলে পাঠাবেন। শুনে মা আপত্তি জানালেন। রাজপুতানীর মেয়ে কখনও অন্দর ছেড়ে বাইরে যায় না—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি বেঁচে থাকতে কিছুতেই সে অঘটন হতে পারে না। বাবা তবুও নাছোড়বান্দা। সুতরাং বাধ্য হয়েই অবশেষে মা আত্ম-হত্যা করলেন। মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার আগে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা মাতৃহীন ছেলে-মেয়েরা কেউ অনাথ আশ্রমে, কেউ চ্যারিটি স্কুলে প্রেরিত হলাম।

সেই স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করেই স্কীনার কলকাতায় এসেছিলেন। এবার

চললেম কানপুরে, বাবার কাছে। কলকাতায় ঠাঁই না মিললেও যদি স্বপ্নটা পূর্ণ হয়, কোথাও সৈনিক হওয়া যায়।

কানপুরে বাবা হারকিউলিস স্কীনার তখনও একজন সামান্য সৈনিক। ১৭৭৩ সন থেকে সৈন্যবাহিনীতে আছেন তিনি, কিন্তু বিশেষ কোন পদোন্নতি হয়নি তাঁর। তখনও তিনি লেফটেনেণ্ট। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁর অভাবের সংসার।—ছোট ছেলেকে মাসে মাসে তিরিশ টাকা পড়ার খরচ জোগানও তাঁর কাছে দায়। ছেলের বাসনা শুনে তাই তিনি সানন্দে মাথা নাড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবে স্কীনার, কার বাহিনীতে? তিনি নিজে সৈনিক হয়েছেন ভাইয়ের জোরে। ভাই জেমস ৬নং নেটিভ ইনফেন্ট্রিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হারকিউলিস এদেশে এসেছেন, কোম্পানির ফৌজে চাকুরী পেয়েছেন। কিন্তু এখন দুয়ার বন্ধ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কোন পথ নেই সরকারী চাকুরী পাবার। অথচ, পিতা হয়ে তিনি কি করে অস্বীকার করবেন তাঁর পুত্র জেমস—'হাফ-কাস্ট',—ফিরিঙ্গী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এক যদি জেমস এখন কোন দিশি নবাব বা রাজার ফৌজে যোগ দেয়!

—আমি তাই দেব! জেমস নির্দ্বিধায় ঘোষণা করল। কলকাতায় সেই চাবুকের ঘা-টা তার কলজেয় বসে গেছে, মায়ের কথা মনে পড়ছে—দরকার হয় এ-দেশের মারাঠা রাজপুতদের সঙ্গে মিশে সে কোম্পানির সঙ্গেও লড়বে—প্রতিশোধ নেবে!

বাবা আপত্তি করতে পারলেন না। ছেলের হাতে তিনি তুলে দিলেন একটি ঘোড়া, কিছু অর্থ, আর নিজের একখানা তলোয়ার। ততদিনে বার্নও কলকাতা থেকে কানপুরে এসে মিলিত হয়েছেন। তিনি জেমসের পকেটে গুঁজে দিলেন, খামে-ভরা একটি চিঠি। জেমস সেই তলোয়ার কোমরে বেঁধে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে কানপুর থেকে কয়েল-এর দিকে ঘোড়া ছোটালেন। কেউ জানল না, যাওয়ার আগে পাগলা ছেলেটা মায়ের ঘর থেকে কি একটা অমূল্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে ঘর ছাড়ল। ইতিহাসে শুধু আছে আলিগড়ের অদূরে সিন্ধি-

য়ার দুর্ধর্ষ ফরাসী সেনাপতি বেনোয়া দ্য বোয়াঁর ছাউনীতে এসে স্কীনার মারাঠা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই ক্রমে একদিন তিনি বিখ্যাত সিকেন্দর সাহেব হয়েছিলেন।

মাসে দেড়শ' টাকার সামান্য সৈনিক থেকে হাজার হাজার প্রজার প্রভু—সিকেন্দর—স্কীনারের উত্থান পথটা শুধু দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত বন্ধুর, রক্তাক্ত। সে কাহিনী শুনতে হলে সেদিনের উত্তর এবং মধ্যভারতের প্রতিটি লড়াইয়ের মাঠে ঘুরে বেড়াতে হবে আমাদের। সংক্ষেপে বললেও সে অনেক কথা। তার চেয়ে এটুকু শুনে রাখা ভাল ১৮০৩ সন-পর্যন্ত দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গী লড়ায়ে স্কীনার ছিলেন প্রথমে সিন্ধিয়ার সেনাপতি দ্য বোয়াঁ এবং পরে পেঁর-র অন্যতম অনুচর। সাকুল্যে আটবছর ছিলেন তিনি মারাঠা বাহিনীতে। সে সময়ে এমন কোন যুদ্ধ হয়নি যাতে তাঁর প্রিয় বর্শাটি হাতে বেপরোয়া স্কীনারকে দেখা যায়নি। ১৮০৩ সনে ফরাসী সেনাপতি পেঁর মারাঠা বাহিনী থেকে সমুদয় ইংরেজদের ছাঁটাই করার পর স্কীনার তাঁর অনুচরদের নিয়ে যোগ দিলেন বৃটিশ বাহিনীতে। কোম্পানি তখন স্কীনারকে চিনেছে, তাঁর তলোয়ারের ধার তাদের চোখে পড়েছে। স্কীনার খাতায় নাম লেখবার আগে জানালেন—তাঁর দুটি শর্ত আছে। কোম্পানি যদি তা মেনে নেয় তবেই তিনি যোগ দিতে রাজী, নয়ত নয়। কি শর্ত? ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ জানতে চাইলেন। প্রথম শর্ত—আমার সঙ্গে সঙ্গে যে সব হিন্দুস্থানী সেপাই মারাঠা বাহিনী ত্যাগ করেছে, তাদের কোম্পানির ফৌজে নিতে হবে, দ্বিতীয় শর্ত—কোন অবস্থাতেই সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে বলা চলবে না আমাকে!

কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সবিস্ময়ে তরুণটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলন। তাঁরা ভাবতেও পারেননি, বিতাড়িত কোন সৈনিক তাঁর পূর্বতন মনিবের প্রতি এমন বিশ্বস্ততা দেখাতে পারে! স্কীনার গ্রাম্য ভারতীয়ের মত বলেছিলেন—ভুলে গেলে চলবে কেন বন্ধু, আমার পেটে সিন্ধিয়ার নিমক?

কোম্পানির প্রধান সেনাপতি তখন জেনারেল লেক। তিনি নিজে যোদ্ধা ছিলেন, যোদ্ধার মুখের ভাষার অর্থ জানতেন। স্কীনারকে তিনি

বুকে টেনে নিলেন। ভারতের সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে নতুন একটি বাহিনীর জন্ম হল। ঘোড়সওয়ারদের বেপরোয়া সেই বাহিনীর নাম—'ক্যাপ্টেন স্কীনার্স' কোর অব ইররেগুলার ক্যাভেলরি'। তাদের প্রিয় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যে দু' হাজার হিন্দুস্থানী যোদ্ধা মারাঠা বাহিনী ছেড়ে এসেছিল তারাই এ বাহিনীর সৈনিক—স্কীনার অধিনায়ক সেনাপতি।

নবীন উৎসাহে তরুণ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের বাহিনী সাজাতে লেগে গেলেন, সৈন্যদের গায়ে এতকাল ছিল সিন্ধিয়ার সবুজ কোর্তা। সেটি বাতিল হয়ে গেল। তার জায়গায় এল ত্যাগের প্রতীক—হলুদ কোট, শৌর্যের প্রতীক লাল পাগড়ি। স্কীনারের অনুচরেরা এই নতুন যুদ্ধ সাজে সেজে তাদের অধিনায়কের সামনে এসে দাঁড়াল। এখন থেকে ইতিহাসে নতুন পরিচয় তাদের, তারা—'ইয়োলো বয়।'

'ইয়োলো বয়'দের পতাকায়ও স্কীনার নিজের স্বপ্ন এঁকে দিলেন। তার প্রতীক হিসেবে তিনি গ্রহণ করলেন নিজের বংশ-প্রতীক স্কীনারদের রক্তমাখা হাত। এই হাতটি উল্কি হয়েও তাঁর পেটে মুদ্রিত হল। উদ্দেশ্য : দেহ থেকে মুণ্ডুটা যদি কখনও কারও তলোয়ারের ঘায়ে ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও অনুরাগীরা শবটা চিনবে, এ লড়িয়ে যে হারকিউলিস স্কীনারের ছেলে জেমস তা জানতে পারবে! পরবর্তীকালে বাহিনীর পতাকা হিসেবে স্কীনার গ্রহণ করেছিলেন সম্পুর্ণ এ দেশীয় প্রতীক। হলুদ কাপড়ের সেই নিশানে আড়াআড়ি দুটি তলোয়ারের নীচে লেখা ছিল—'হিম্মৎ মর্দন মুদ্দৎ খোদা!—'গড হেলপস্ দোজ হু হেলপ দেমসেলভ্‌স!'—ঈশ্বর কেবল মাত্র তাদেরই সহায়, যারা নিজেদের সহায়।

মনে মনে এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই স্কীনার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ১৮০৩ সন থেকে '৩৩ সন অবধি বিখ্যাত 'ইয়োলো বয়'দের তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। কখনও দল তাঁর ভেঙে গেছে, কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গৃহস্থ-বেশে স্কীনার ফিরে গেছেন লোকালয়ে। জমি কিনেছেন, কলকাতার এজেন্সি হৌসে টাকা খাটাবার চেষ্টা করেছেন, নীল ভুঁইয়া হয়েছেন—

কিন্তু আবার রণক্ষেত্রে ডাক পড়েছে তাঁর। সরকার যখনই বিপাকে পড়েছেন তখনই খবর এসেছে—স্কীনার তৈয়ার !

মারাঠা যুদ্ধের পর ১৮০৬ সনে কর্নওয়ালিশ-এর নব-বিধানে স্কীনার বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন। ক'জন সৈন্যকে রেখে বাহিনীর আর সবাইকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। স্কীনারের জন্যে ধার্য হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকার জায়গীর। কিন্তু বৃটিশ প্রজা বলে তাও শেষ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হল। পরিবর্তে ধার্য হল কর্নেলের প্রাপ্য পেন্সন—মাসিক মাত্র তিনশ' টাকার মাসোহারা! নিশ্চয় স্কীনার সেদিন মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ হানসীতে এবং আলিগড়ে ততদিনে তাঁর জায়গীর ছোটখাট একটা রাজ্যের আকার নিতে চলেছে। গুটিকয় নীলের ফ্যাক্টরী মালিকানা হাতে এসেছে এবং কলকাতার হৌসে হৌসে দাদনি টাকার অঙ্ক প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

১৮০৯ সনে শিখ যুদ্ধের সম্ভাবনায় আবার ডাক পড়ল স্কীনার এবং তাঁর 'ইয়োলো বয়'দের। পরবর্তী দশ বছরে স্কীনারই ছিলেন গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী এলাকায় ইংরেজের হাতে প্রধান হাতিয়ার। '১৪ সনে তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল তিন হাজার। ইংরেজের হয়ে গোর্খাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন স্কীনার, তারপর পিণ্ডারীদের সঙ্গে। কর্নেল স্কীনার তখন রাজ্যে রাজ্যে ছাউনিতে রীতিমত একটি নাম। তাঁর 'ইয়োলো-বয়'রা যে-কোন শত্রু শিবিরে বিভীষিকা। সূচনায় যা ছিল 'ক্যাপ্টেন স্কীনার্স' কোর অব ইররেগুলোর ক্যাভেলরি'—ততদিনে মুখে মুখে নাম হয়ে গেছে তার স্কীনার্স হর্স'—এবং তার অধিনায়ক বিপুল দেহী তীক্ষ্ণধী স্কীনারের নাম হয়েছে—সিকেন্দর। 'ই-স্-কীনার' থেকে মুখে মুখে বিজয়ী-সিকেন্দর'।

অনেক যুদ্ধ করেছেন স্কীনার। সম্মানও পেয়েছেন অনেক। প্রধান সেনাপতি লেক তাঁকে নিজের তলোয়ার উপহার দিয়েছেন, তিনি লেফ-ট্যান্যেণ্ট কর্নেল-এর পদগৌরবে ভূষিত হয়েছেন, 'কম্পেনিয়ান অব দি অর্ডার অব দি বাথ' মনোনীত হয়েছেন। তিনি গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের সঙ্গে তাঁর সহচর হিসাবে রণজিৎ সিংহের দরবার পরিদর্শন করেছেন, রাজস্থান

ভ্রমণ করেছেন; কলকাতায় কোন এক ছাপাখানার জনৈক পলাতক বালক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে লেক, মিণ্টো, হেস্টিংস, ডালহৌসি, বেন্টিঙ্ক ইত্যাদি বিখ্যাত নামগুলোর মুখে মুখে ঘুরেছেন; প্রিন্সেপ, মেটকাফ, অক্টরলনি, ম্যালকম, ফ্রাসার, এলফিনস্টোন—প্রভৃতির সঙ্গে সমান হয়ে বসে আড্ডা দিয়েছেন; তাঁর নামে আজও ভারতায় বাহিনীর বিখ্যাত- স্কীনার্স হর্স!' স্কীনার শুধু 'বাদশা' ছিলেন না,—সরকারী ইতিহাসে তাঁর পরিচয় প্রথমত সেনাপতি হিসেবেই।

ইংরেজের আশা পুর্ণের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৯ সনে স্কীনার্স হর্স' আবার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। স্কীনারকে বলা হয়েছিল—"আপাতত যুদ্ধ ক্ষান্ত, তুমি বড়জোর তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য হাতে রাখতে পার। তিন বছর পরে আবার ছাঁটাইয়ের হুকুম জারী হল। লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল—'স্কীনার্স হর্স'-এর ইতিহাস হয়ত সেখানেই শেষ। কিন্তু অধিকৃত রাজ্যসমূহে আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল, ফলে ১৮১২ সনে 'স্কীনার্স হর্স'-এর কথা উঠল। '৩১ সনে আবার। অবশ্য, সেবার তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র যাট জন। '৪২ সনে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্থানীয় পুলিস বাহিনীর মত ছোট্ট সেই বাহিনীটিরই অধিনায়ক ছিলেন—এককালের বিখ্যাত কর্নেল—সিকেন্দর সাহেব! কিন্তু বাহিনীটি আয়তনে ছোট হলেও যে ঐতিহ্যে তা ছিল না, তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে স্কীনার্স হর্সের পরবর্তী ইতিহাস শুনলে। স্কীনারের মৃত্যুর পরে আফগান যুদ্ধ উপলক্ষে নতুন করে আবার 'স্কীনার্স হর্স' প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। পুরনো বাহিনীটির নাম দেওয়া হয়—'বেঙ্গল ইররেগুলার ক্যাভেলরি'। ক্রমে নামের আগে থেকে সিকেন্দরের স্বাধীন জমানার প্রতীক 'ইররেগুলার' কথাটা বাদ দেওয়া হল এবং 'স্কীনার্স হর্স'-এর দুটি রেজিমেণ্ট নিয়ে গঠিত হল ১নং বেঙ্গল ক্যাভে- লরি এবং ৩নং বেঙ্গল ক্যাভেলরি। পরবর্তীকালে আবার নাম বদল হল তাদের। তৎকালে ওদের নতুন নাম 'ডিউক অব ইয়র্কস ওন স্কীনার্স হর্স'। যতদুর জানি আজ স্বাধীন, ইংরেজহীন ভারতেও বেঁচে আছে এই অশ্বারোহী বাহিনীটি এবং ডিউক অব ইয়র্ক বাতিল হয়ে গেলেও এখনও

সেই বাহিনীর হিন্দুস্থানী জওয়ানদের মুখে মুখে বেঁচে আছেন সৈনিক সিকেন্দর। কেন না, সেই ঐতিহাসিক বাহিনীটির নাম আজ শুধুই—'স্কীনার্স হর্স'। ক'বছর আগে ১৯৫৩ সনে সাড়ম্বরে ভারতে ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেছে তার। সে অনুষ্ঠানে হানসী থেকে জওয়ানদের হাতে এসেছিল একটি অপ্রত্যাশিত উপহার। সেটি—ফার্সীতে লেখা সিকেন্দরের সেই বিখ্যাত আত্ম-কথা। শোনা যায়, ১৯১১ সনে স্কীনারের দৌহিত্র রবার্ট (Robert Hercules Skinner) দিল্লির দরবার উপলক্ষ্যে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন এটি। সে বাসনায় একটি যোগ্য আধার তৈরির জন্যে দিল্লির বিখ্যাত এক সোনা-কারিগরের কাছে পাঠানো হয় পাণ্ডুলিপিটি ওঁরা দরবারের আগে তা আর করে উঠতে পারেননি। ফলে, পঞ্চম জর্জ আর তা হাতে পাননি। তাতে রবার্টের মন খারাপ হয়েছিল হয়ত, কিন্তু লাভ হয়েছে ভারতীয় ফৌজের, একশ পঞ্চাশ বছর পরে তারা বহুশ্রুত লড়িয়ে সিকেন্দরের আপন-কথাটি আজ হাতে পেয়েছে; এবং বলতে গেলে প্রায় নিজেদেরই ভাষায়। অবশ্য, শুধু বাহিনীর নাম আর এই সোনার জলে সাজ-পরানো ফার্সী পুঁথিটিই নয়—সিকেন্দর আজ বেঁচে আছেন তাদের অধিনায়কের আচরণে, অবয়বে। শোনা যায়, ভারতীয় বাহিনী 'স্কীনার্স হর্স'-এর পুরোভাগে আজ যে ভারতীয় তরুণটি, নাম তাঁর—লেফট্যানেণ্ট কর্নেল মাইকেল স্কীনার। এবং তিনি সিকেন্দরেরই—গ্রেট গ্রেট গ্রাণ্ড সন! ইতিপূর্বে বংশের আরও একজন এ গৌরব পেয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ ১১৯ বছর পরে (১৯৬০ সনে) আবার সিকেন্দরের আপন বংশের সন্তান!—সিকেন্দর কী তবুও ইতিহাস?

প্রায় দুশ' বছর পরে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ভারতের কানে হয়ত আজ এই যোগাযোগটা নেহাৎ কাকতালীয় শোনাত—অনেক ক্যাপ্টেন কর্নেলের মত স্কীনারও আজ নিশ্চয় হারিয়ে যেতেন—কিন্তু হানসীতে দিল্লিতে

আলিগড়ে পাঞ্জাবে তবুও যে সিকেন্দর বেঁচে রয়েছেন তার পিছনে রয়েছে সেই আমের চাটনীর ভাণ্ড, আর সেই ছোট হাতিয়ারটি—কানপুর ছেড়ে আসার দিনে রাজপুতানী মায়ের ঘর থেকে যা তিনি চোরের মত পকেটে পুরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছিলেন। সেটি একটি চামচ। সোনার নয়, রূপোর নয়, সাধারণ একটি পিতলের চামচ। বাবার কাছে স্কীনার শুনেছিলেন—তিনি যখন কোলে তখন তাঁর মা, জনৈক সাধারণ সিপাইয়ের রাজপুতানী বউ—এই চামচেই তাঁকে দুধ খাওয়াতেন! মাকে ভালবেসেছিলেন স্কীনার; তাঁর যন্ত্রণাটা তিনি সেই তরুণ বয়সেই জানতেন; চিরকালের মত ঘর ছাড়ার সময়ে তাঁর স্মৃতি হিসেবে অতি সঙ্গোপনে তাই পিতলের চামচটা পকেটে পুরেছিলেন।

ঈশুরী আর তার আমের আচার ছিল পরবর্তীকালের বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রী স্কীনারের বাদশাহী প্রতীক। তিনি যে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন, এই আমের চাটনীর ভাণ্ডটি বোধ হয় তারই একটুকরো প্রমাণ। স্কীনার কোম্পানির ফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে কোন কোন ভারতীয় শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেও—দিল্লি আগ্রার প্রজারা তাঁকে ভালবেসেছিল, কারণ যুদ্ধ রাজকীয় ব্যাপার। সাধারণ মানুষ জেনেছিল—হিন্দুস্থানকে ভাল না বাসলে সাহেব কখনও এমন করে তাদের ভালবাসতে পারত না; এমন করে তাদের কাছে আসতে পারত না।

প্রভূত সম্মান এবং বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও স্কীনার অর্থ অথবা তলোয়ারের বলে ঘরে তোলা ঈশুরীকে এমন করে ভালবাসতে পেরেছিলেন, তাকে সাহেবী দরবারেও 'মাই ওল্ড লেডি' বলে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তার এবং নাম না জানা হিন্দুস্থানী মেয়েদের সন্তানদের নিজের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়ে যেতে পেরেছিলেন—কারণ ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পরও সিকেন্দর সেই চামচটি পকেটে রাখতেন।

হানসী, বুন্দেলশর অথবা দিল্লি—ভোজের আয়োজনটা যেখানেই হক না কেন, স্কীনারের খাওয়ার টেবিলে সেই পিতলের চামচটা বরাবর অবশ্য ছিল। সোনা রূপোর ভিড়ে পিতল বলেই সেটি সকলের আগে চোখে

পড়ত। সিকেন্দরের মায়ের কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত ছেলেদের মাসে তিরিশ টাকা দিতে গিয়ে বাবার কষ্টের কথা। তাঁর আপন কুলের কথা, হিন্দুস্থানের গরীবের কথা। তিনি তাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতেন, আশপাশের সমুদয় গ্রামের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন—অভিভাবক, 'পিতা'। মাঝে মাঝেই হানসীতে 'ইয়োলো-বয়'দের ভোজসভা বসত। সেনানায়কের গাম্ভীর্য এবং পোশাক দুই-ই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিকেন্দর নিজের হাতে তাদের পরিবেশন করতেন। বলতেন—লজ্জা কী, আমিও সিপাই, আমিও গরীবের বেটা। খোদার কাছে আমারও পরিচয় খিদমদগার!

বার্ধক্যে সিকেন্দরের জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত, বন্ধু ফ্রাসারের মৃত্যু। ফ্রাসারও হিন্দুস্থানকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরোজপুরের নবাব সামসুদ্দিন খুন করিয়েছিলেন ওঁকে। স্কীনার সামসুদ্দিনকে ক্ষমা করেননি। তাঁরই চেষ্টায় ধরা পড়েছিল খুনী। বিচারে যোগ্য সাজাও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সামসুদ্দিনের প্রাণদণ্ডের পর নিজে প্রাণ ভয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ স্কীনার। প্রতিদিন রাত্রে নাকি হানসী প্রাসাদে তিনি ঘর বদলাতেন। কোথায় ঘুমবেন—তাঁর অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যও সে খবর পেত না। খবর রাখলেও পরদিন ভোরে দেখা যেত—তা ভুল। স্কীনার মাঝ-রাত্তিরে আবার ঘর বদল করেছেন।

স্কীনার হিন্দুস্থানকে যে ভুল বুঝেছিলেন—তার প্রমাণ তাঁর মৃত্যু। ১৮৪১ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটায় হানসীর প্রাসাদে কর্নেল জেমস স্কীনার, আকস্মিকভাবে ভারতের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু তামাম হিন্দুস্থান জানে কোন হিন্দুস্থানী আততায়ীর ক্রূর ছুরি নয়, কোন হিন্দুস্থানী ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় নয়—সিকেন্দর মারা গিয়েছিলেন—পেটের পীড়ায়, অত্যধিক রক্তপাতের ফলে। এবং সেদিন শুধু তাঁর হারেমই গলা ছেড়ে কাঁদেনি—পাতিয়ালার মাপের একটি বিস্তীর্ণ এলাকার নারী পুরুষ, শিশু সবাই চোখের জল ফেলেছিল। সিকেন্দর এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তারা কেউ তা ভাবেনি।

মৃত্যুর পর হানসীতে কবরস্থ করা হয় তাঁকে। পরের মাসে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে তাঁর বাসনা অনুযায়ী শবাধার স্থানান্তরিত করা হয় দিল্লিতে, সেণ্ট জেমস চার্চে। 'চার্চের উঠোনে নয়, ভেতরে রাখবে আমাকে। সেখানে যাঁরা আসবেন আমি তাঁদের প্রত্যেকের পদাঘাত চাই।—'সো দ্যাট দে মে ট্র্যাম্পল অন দি চীফ অব সিনার্স!'

হানসী থেকে দিল্লির পথে একটি শোভাযাত্রা দেখা গিয়েছিল সেদিন। অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা। আগে একটি কফিন, পিছনে গেরুয়া-পোশাকে ঘোড়ার পিঠে হাজার সওয়ারদের সারি, তার পিছনে হাজার হাজার প্রজা। দিল্লিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হাজারের সারি অযুতের সাগরে পরিণত হল। গোটা শহর যেন সেণ্ট জেমস গীর্জার অঙ্গনে এসে আছড়ে পড়ল। কোম্পানি তেষট্টি তোপে মৃতকে সম্মান জানাল, পথের মানুষ নয়নের বিন্দুতে তর্পণ করল। সে দৃশ্য না দেখলে নাকি বোঝা যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'নো এম্পারর অব হিন্দুস্থান ওয়াজ এভার ব্রট ইনটু ডেল্লি ইন সাচ স্টেট অ্যাজ সিকেন্দর সাহিব!'

এ সাক্ষ্যটা হয়ত বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু সিকেন্দর যে হিন্দুস্থানের কাছে 'সাহেব'মাত্র ছিলেন না তার প্রমাণ ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ। গোটা দিল্লি সেদিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ফিরিঙ্গীর কোন চিহ্নই বাদ ছিল না। কিন্তু সিকেন্দরের সমাধির সামনে এসে ওরা নাকি উদ্ধত হাত নিজেরাই গুটিয়ে নিয়েছিল। কে একজন শুধু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—'ইয়ে সিকেন্দর সাহেব হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চোখের আগুন দপ্ করে নিবে গিয়েছিল। ওরা মাথা হেঁট করেছিল। সিপাহীরা সেলাম জানিয়ে তবে আগুন হাতে অন্য পথে পা বাড়িয়েছিল।

দিল্লির সেণ্ট জেমস গীর্জা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অনেক রাজত্বের কবর, অনেক রাজত্বের স্মৃতিভূমি ইন্দ্রপ্রস্থের পুরনো মাটিতে। এখনও তেমনি নবযুগের হাতিয়ার হাতে নিয়ে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটে বেড়ায় 'স্কীনার্স হর্স' নামে একটি অশ্বারোহী বাহিনী।

—সমগ্র-অর্থে 'রাজা' না হলেও ভারতে আজও বেঁচে আছেন— 'নাসিরউদ্দৌলা কর্নেল জেমস স্কীনার বাহাত্বর গালিব জং'—হানসীর সিকেন্দর। কিন্তু উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বহরমপুরের ফিরিঙ্গী-কবরখানা তছনছ করে ফেললেও কোন নিশানা পাওয়া যাবে না 'জৌরুজ জং' নামে সেই আইরিশ বাদশাটির যিনি সত্যিই একদিন স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাজত্বের অধিশ্বর ছিলেন এবং স্কীনার হানসীতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার আগে যাঁর সিংহাসন বুকে ধারণ করে হানসী একদিন সত্যিই ছিল রাজধানী! ঠিক তেমনি যদি কেউ আজ খাসগঞ্জের বাদশা 'গার্ডনার-হর্স'-এর বিখ্যাত অধিনায়ক কর্নেল গার্ডনার নামে কাম্বের নবাব বাড়ির জামাতাটির সন্ধানে হিন্দুস্থানের পথে নামেন তবে কেউ সন্ধান দিতে পারবেন না তাঁর। আগ্রায় নিশ্চয় কেউ তাঁকে চিনবে না, আগ্রা থেকে ষাট মাইল দূরে খাসগঞ্জে যেখানে একদিন তিনি হুঁকোর নল মুখে লাগিয়ে বাদশাহী চঙয়ে নিজের জায়গীরের খবরাখবর করতেন, দিল্লির বাদশাহদের ঘরের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ চলতে পারে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে ছ'দিন সময় নিতেন—সেখানেও কেউ যে আজ বড় একটা তাঁর খবর বলতে পারবে তেমন মনে হয় না। বড়জোর কেউ হয়ত আঙুল তুলবে আরও দূরে, আরও ভেতরে মানোতা নামে একটি গাঁয়ের দিকে। সেখানে গেলে দেখা যাবে—একটি ভাঙা কুটিরের বারান্দায় আধভাঙা খাটিয়ায় বসে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর পরনে পাজামা, গায়ে ইংলিশ শার্ট। পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতেই বলবেন তিনি নাম তাঁর—অ্যালান লেজ গার্ডনার। ক্রমে আলাপ হলে জানা যাবে—তিনি একজন লর্ড, ইংলিশ ব্যারন। তবে উপাধিটা সরকারীভাবে এখনও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। কেন না, তার জন্য আগ্রা অবধি গেলেই চলবে না, বিলেত যেতে হবে। তার টাকা কোথায়?

অথচ শুধু টাকা নয়, খাসগঞ্জের গার্ডনার সাহেবের সবই ছিল। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম। শিরায় নীল রক্ত ধারণ করেই ভারতে নেমেছিলেন উইলিয়াম, উইলিয়াম লিনাউস গার্ডনার। বিখ্যাত লর্ড অ্যালেন গার্ডনার

ছিলেন তাঁর খুড়ো কিংবা জ্যাঠা। উইলিয়াম লেখাপড়াও শিখেছিলেন। ভারতে আসার আগে প্যারিসে তিনি ছাত্র ছিলেন। ফলে, বেকায়দার বদলে তিনি বৃটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেনের কোট গায়েই এদেশের মাটিতে নেমে-ছিলেন। কিন্তু নামমাত্র হিন্দুস্থানের হাওয়া খানদানী ইংরেজের নীল রক্তে ক্রিয়া শুরু করে বসল। তরুণ গার্ডনার বাদশাহী স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। আর্ধেক হক, সিকি হক—রাজত্ব এবং রাজকন্যার ধ্যান তাঁকে পেয়ে বসল। অচিরাৎ তিনি কোম্পানির বাহিনী ত্যাগ করলেন। তারপর যোগ দিলেন হোলকার বাহিনীতে। সে ১৭৯৮ সনের কথা।

দিন যায়। গার্ডনার স্বপ্ন দেখেন—যুদ্ধ করেন, লড়াই শেষে বেঁচে আছেন জানা মাত্র আবার স্বপ্ন দেখেন। অবশেষে একদিন সত্যিই স্বপ্ন যেন পূর্ণ হতে চলল। কাম্বের নবাবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এক সময় চোখ পড়ল সিংহাসনের পেছনে, দরবারের ওপরে অলিন্দের মত ঝুলছে যে ঘরটি তার জানলার চিকের ওপর। গার্ডনারের জানা ছিল—দরবারে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকানো রীতি নয়—বিশেষ কারোখায় চোখ দেওয়া নিতান্তই বেয়াদবী। কিন্তু তিনি আজ কাম্বের দরবারে ভিক্ষাপ্রার্থী বিদেশী নন,—শক্তিমান হোলকারের দূত। এখানে এসেছেন তিনি হোলকারেরই নির্দেশে। সুতরাং গার্ডনার আবার কথা বলতে বলতে অমনযোগী হয়ে গেলেন, আবার তাঁর চোখ পালিয়ে গেল চিকে। এবার শুধু হরিণের মত চঞ্চল দুটি চোখ নয়, যৌবনবতী আবছা একটি নারী-দেহের খসড়াও যেন চোখে ঠেকল, তাঁর গড়নে পরীদের আদল।

পরদিন আবার প্রাসাদ, আবার সেই চোখ, সেই স্বপ্ন। তার পরদিন আবার। তৃতীয় দিন ব্যারনের বংশের সন্তান আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না;—তিনি প্রত্যক্ষই 'নাইট' হয়ে গেলেন, নবাবের কাছে সোজাসুজি প্রস্তাব দিয়ে বসলেন।

হোলকারের দূত, সমর্থ ইংরেজ জওয়ান, তদুপরি বিলেতের খানদানী বংশ। সুতরাং—কথা হল। কথা পাকাও হল। গার্ডনার আশ্বাস নিয়ে বের হতে হতে আবার ফিরে দাঁড়ালেন—মনে রাখবেন নবাব, ওই

চোখ। আমাকে যদি অন্য কাউকে দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করেন তবে সে বৃথাই চেষ্টা!

নবাব সে চেষ্টা করলেন না।

গার্ডনার লিখছেন: বিয়ের পর মুখ চন্দ্রিকা। তার আগে কিছুই জানবার উপায় নেই। মনে মনে আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি। ঘোমটা তোলা হল। আর্শিতে তার মুখ। সে হাসল। আমি হাসলাম।

শুধু রাজকন্যা নয়, রাজ্যও এসেছিল একদিন গার্ডনারের ভাগ্যে। নবাবজাদী জহর-উল-নিসার ঘরে আসার পর হোলকারের কাজ আর বেশী দিন করতে পারেননি তিনি। কেন না, হোলকার বদমেজাজী, তাঁর রাজত্বে বাস করে জহুর-উল-নিসার সম্মান রক্ষা সম্ভব ছিল না। একদিন দরবারের কাজে বাইরে গিয়েছেন গার্ডনার, সেদিন আর ফেরা হল না। দরবারী কাজেই রাতটা থেকে যেতে হল তাঁকে। পরদিন ফিরে আসা মাত্র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হোলকার—কী পেয়েছে তুমি সাহেব? আজও যদি না ফিরতে, তবে তোমার খানাত আমি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতাম! কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল। খানাত মানে আস্তানার চারপাশের ক্যানভাসের বেড়াটি, তার ভেতরেই জহুর-উল-নিসা থাকেন।—তাঁকে অপমান করা? অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্ত দপ করে জ্বলে উঠল, কোমর থেকে এক ঝটকায় তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন গার্ডনার—সাবধান হোলকার! জেনানার মান রক্ষা করে কথা বলো! নয়ত, আজ তোমার এখানেই শেষ! হোলকার গার্ডনারের এ মূর্তি কখনও দেখেননি। খুনীর মত ধীর পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে তাঁরই ভৃত্য গার্ডনার। চোখে তাঁর আগুন। প্রাণভয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। পাত্রমিত্র- সবাই হতবাক। তাঁরা সকলে মহারাজকে রক্ষার জন্যে তাঁর দিকে ধাওয়া করলেন। হঠাৎ গার্ডনারের জ্ঞান ফিরে এল যেন। তাঁর মনে হল কাজটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মনে পড়ল, হোলকার বদরাগী হলেও হিন্দুস্থানের অন্যতম শক্তিমান নৃপতি, তিনি তাঁর কর্মচারী মাত্র! এ অপরাধের শাস্তি তাঁর অনিবার্য। হোলকার বা তাঁর পারিষদবর্গদের কেউ সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ভিড় ঠেলে

বাইরের দিকে পা বাড়ালেন গার্ডনার। তারপর এক লাফে নিজের ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসলেন। সেই যে গেলেন, গেলেনই। হোলকার কোনদিন আর হাতে ফিরে পাননি ওঁকে।

কখনও তাপ্তী তীরে রাজা অমরত রাওয়ের হাতে বন্দী থেকে, কখনও ঘেসুড়ের বেশে বনে বনে ঘুরে ঘুরে, কখনও জয়পুরের দরবারে ফৌজী কাজ করে, কখনও বা ইংরেজের জন্যে ঘোড়সওয়ার বাহিনী সাজিয়ে—অবশেষে সেই পলাতক গার্ডনার যেদিন ঠিকানা নিয়েছেন তখন তিনি আগ্রা প্রদেশে বিখ্যাত সামন্ত। কাম্বের নবাবের হস্তক্ষেপে পলাতক ফিরিঙ্গীর পরিবার-পরিজনকে জব্দ করতে পারেননি হোলকার। জহুর-উল-নিসাকে যথাসময়ে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আবার বেঁধে নিয়েছিলেন গার্ডনার। এখন তিনি খাসগঞ্জের ফিরিঙ্গী বাদশা। গার্ডনারের ঘরে অন্যতম সংবাদ—পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁর সুখী বেগমের জীবন। গার্ডনারকে পুরোপুরি হিন্দুস্থানী করে ফেলেছেন তিনি, কিন্তু নিজে হয়েছেন মুসলমানীর বেশে ইংরেজী-বিবি—তাঁর চারপাশে আর কোন সতীনের ঘর নেই। একাকী জহুর-উল-নিসাকে নিয়েই খাসগঞ্জের বাদশার হারেম।

এদিকে কিঞ্চিৎ টান থাকলেও অন্যদিকে পূর্ণ বাদশা ছিলেন গার্ডনার। হাতি-ঘোড়া, সেপাই-সামন্ত জায়গীর-খামার—সবই ছিল তাঁর। খাটিয়ায় বসা বৃদ্ধ অ্যালান সাহেবকে দেখলে যে আজ পড়শিদের চোখে জল আসে সে শুধু বিলেতে গেলে তিনি একটা 'লর্ড' পেতে পারতেন এ-খবরটা তারা জানে বলেই নয়, অ্যালান সাহেব নিশ্চয় সেই দিনগুলোর খবরও কিছু কিছু শুনিয়েছে তাদের। দিল্লির বাদশা স্বয়ং দ্বিতীয় আকবর শাহের পালকী বাঁধা তখন খাসগঞ্জের গার্ডনারের দুয়ারে।

দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল জহুর-উল-নিসার। বড় ছেলে জেমস বিয়ে করেছিল দিল্লিতে, আকবর শাহের বোনের মেয়েকে। গার্ডনার খুব জাঁকজমক করেছিলেন তার বিয়েতে। কেন না রাজকন্যার সঙ্গে বাদশাহ গার্ডনারদের একটা জায়গীরও দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র অ্যালেন বিয়ে করেছিলেন দিল্লিরই আর এক নবাবজাদীকে। তাঁর স্ত্রী বিবি সাহেবা

হিনজার দুটি মেয়ে ছিল—সুজান আর হারমুজি। বুড়ো গার্ডনার মারা যাওয়ার পরের বছর ১৮৩৬ সনে হারমুজিকে বিয়ে করেন আবার একজন অ্যাংলো-স্যাক্সন। তিনি গার্ডনারের নিজের আদি বংশেরই জনৈক উইলিয়াম গার্ডনার। গার্ডনার যেমন ছিলেন প্রথম ব্যারন সাহেবের ভাইপো, ইনিও তাই। দ্বিতীয় ব্যারন তাঁর সাক্ষাৎ খুড়ো। সুতরাং, তৃতীয় পর্যায়ে ইংলণ্ডেশ্বরের খেতাব নেমে এল আগ্রার খামারে, হারমুজি আর উইলিয়ামের ছেলে অ্যালেন হাইড গার্ডনারের ঘরে। যতদূর জানা যায় ১৮৭৯ সনে তিনিও দিল্লির এক শাহজাদীকে ঘরে এনেছিলেন এবং এবং দু'বছর পরে তাঁরও একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু 'লর্ড' আর বসেনি এই বংশের নামের বাঁয়ে। উত্তরপ্রদেশের মানোতা গাঁয়ের বুড়ো অ্যালেন সাহেবের ভাগ্যকে তাই আর দোষ দিয়ে লাভ নেই; লণ্ডন-কাম্বে-দিল্লি, বিলেত আর ভারতের অনেক নীল রক্ত এক সঙ্গে মিশেছিল বলেই হয়ত—অভিযাত্রী গার্ডনারের আদি ঔজ্জ্বল্য টিঁকিয়ে বেশীদিন রাখা যায়নি, কিংবা হয়ত বংশানুক্রমিক রঙের নেশায় সব কটা রঙই একদিন জড়ো হয়েছিল খাসগঞ্জের এই ঘরে, ফলে ইতিহাসের পাতাগুলো আজ অনিবার্য-ভাবে রঙ-চটা, ফর্সা ফর্সা; হয়ত আবছা সাদাকালো এই দাগগুলোও একদিন মিলিয়ে যাবে, হয়ত এই ভাঙা খাটিয়াটাই সেই সোনালী দিনের শেষ খবর!

তবুও আজও একটা কিছু খবর হয়ে আছেন গার্ডনাররা—অর্থহীন হলেও খবরের কাগজের পাতায় হয়ত আবার কোনদিন উঁকি দেবে 'লর্ড' উপাধি সংগ্রহ বাসনায় কোন গার্ডনারের গাঁয়ে গাঁয়ে চাঁদা তুলে বেড়াবার খবর, কিন্তু কোনদিন কেউ দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না—আমিই সেই 'জৌরুজ জং,'-এর রক্তধারী। এই হানসীর আমিই উত্তরাধিকারী! সাচ্চা রাজা, রাজার মত রাজা 'জৌরুজ জং' সেটুকুও বলে যেতে পারেননি কাউকে।

'জৌরুজ জং' বা জঙ্গী জর্জের আসল নাম ছিল—জর্জ টমাস। তাঁর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈনিক বোধ হয় হিন্দুস্থান দ্বিতীয় আর একজন দেখেনি। মাদ্রাজে জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে

দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে ভর রেখে ভারতের মাটিতে লাফিয়ে নেমে এসেছিলেন এই যুবক। সেদিন কেউ তাঁকে চেনে না, কেউ তাঁর নাম জানে না। অথচ কুড়ি বছর পরে এই অজ্ঞাতনামা যুবকই ভারতময় বিখ্যাত শ্বেত-রাজা, জঙ্গী জর্জ।

কি করে জঙ্গী জর্জ এ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ইতিহাস তাঁর নামের মধ্যেই বোধহয় অনেকখানি। সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে—সেই সৌভাগ্যের অন্য নাম তলোয়ার। দীর্ঘ কুড়ি বছর তলোয়ার হাতে ভারতময় এক বিস্ময়কর এবং বিচিত্র জীবন দেখিয়েছেন জর্জ টমাস। কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় খেলা এই "জোরুজ জং" পদবী গ্রহণ।

মতলবটা মাথায় আসে তাঁর হরিয়ানা যুদ্ধের (১৭৯৭-৯৮) পরে, আকস্মিক ভাবে। চারদিকে দুর্বল রাজত্ব, হিন্দুস্থান নিয়ত উত্থান পতনের দেশ। শিখদের হারিয়ে টমাস তাই মনে মনে ঠিক করে ফেললেন—আর ছুটোছুটি নয়, তিনিও 'রাজা' হবেন,—এই বিজিত দেশের রাজা। বিধি যদি অপ্রসন্ন না হন তবে সমগ্র পাঞ্জাব একদিন অধিকার করবেন তিনি। তারপর সমগ্র হিন্দুস্থান। সিন্ধিয়া নয়, হোলকার নয়—দিল্লির বাদশা, কলকাতার কোম্পানি নয়—ভারতের সুলতান হবে জাহাজ পলাতক সৈনিক জর্জ টমাস!

টমাস তক্ষুনি কাজে লেগে গেলেন। ঢাক পিটিয়ে চারদিকে জানিয়ে দিলেন—এখন থেকে পাঞ্জাবের এই হরিয়ানা এলাকার, তিনিই রাজা। এখানে আর কারও কোন অধিকার নেই! ইতিপূর্বে দুর্ধর্ষ লড়িয়েদের এই বসতভূমিতে কেউ কখনও রাজত্ব করতে পারেননি কিন্তু "জোরুজ জং" নিঃশঙ্ক চিত্ত। তিনি ইতিহাস শুনতে আসেননি, ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছেন। তাঁর সৈন্যরা বিনা বাধায় তিন হাজার বর্গমাইল ঘুরে এল। জং ঘোষণা করলেন—আপাতত এই তাঁর রাজত্ব। তৎকালের হিসেবে সেই এলাকার রাজস্ব—প্রায় পনের লক্ষ টাকা। তা হক, আপাতত এতেই চলে যাবে। টমাস রাজধানী সাজাবার কাজে মন দিলেন।

রাজধানী হল, পরবর্তী কালে সিকেন্দরের প্রধান ঠিকানা হান্সী।

হানসী ভারত ইতিহাসের অন্যতম দুর্ধর্ষ দুর্গ। তারই পথে মুসলমানরা বার বার হানা দিয়েছে হিন্দুস্থানের কলজেয়—দিল্লিতে। কিন্তু হানসী হার মানেনি কারও কাছে। টমাস যখন সেখানে এলেন তখন দুর্গ ইতিহাস মাত্র, একমাত্র বাসিন্দা সেখানে জনৈক ফকির আর দুটি সিংহ! অরণ্য আর নিঃসঙ্গতা। টমাস তাই চান, নতুন রাজা তিনি—সব নতুন করে গড়ে তুলতে চান।

গড়ে তুলেও ছিলেন। তাঁর পায়ের স্পর্শে হানসীর দুর্গে আবার প্রাণ ফিরে এল। দেখতে দেখতে দশ ব্যাটেলিয়ান সৈনিকের আস্তানা হল সেখানে, তার উপর পাঁচশ অশ্বারোহী। তাছাড়া দুর্গের বাইরে জৌরুজ জং-এর রাজধানী যে শহর হানসী সেখানেও কমসে কম হাজার ছয়েক মানুষ। রকম দেখে মনে হল হানসী যেন একদিনে মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে, পছন্দের রাজা তার তক্তে বসেছে।

টমাস আরও শক্ত হয়ে বসতে চাইলেন। তিনি নিজের টাকশাল বসালেন। সেখানে তাঁর নামে টাকা তৈরি হয়—সে টাকা শুধু তাঁর সেনাবাহিনীতে নয়, তিন হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত তাঁর রাজত্বের প্রতি ঘরে চলে। টমাস ফাউণ্ড্রি বসালেন—সেখানে তাঁর কামান তৈরি হয়। ছ'বছর আগে যেখানে বলতে গেলে কামানই ছিল না তাঁর, এখন সেখানে ষাটটি মস্ত কামান। সে সব কামান নিয়ে কখনও তিনি জয়পুর, কখনও উদয়পুর বিকানীর পর্যন্ত ধাওয়া করছেন। কখনও শতদ্রু তীরে তাঁর সৈন্যরা ত্রাস ছড়িয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত টমাস সেখানেও শিখদের পরাজিত করেছিলেন। শতদ্রুর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত সমুদয় শিখ রাজ্য তাঁকে মেনে নিয়েছিল। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু তবুও সেই দুর্ধর্ষ লড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ বাদশাহ জৌরুজ-জং-এর কোন চিহ্ন নেই আজকের হরিয়ানায়। কেননা, টমাস এত করেও, এত পেয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর ফরমান ছ'বছরের মধ্যেই তামাদী হয়ে গিয়েছিল—রাজধানী হানসীতে সপ্তম বর্ষেই তাঁর টাকা অচল হয়ে গিয়েছিল এবং বহরমপুরে কবরখানায় ক'বছরের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল

তাঁর কবর। তাঁর রাজধানী হানসীর খ্যাতির পেছনে আজ শুধুই সিকেন্দর।

সম্ভবত টমাসের এই ব্যর্থতায় একমাত্র হেতু সিকেন্দর সেখানে 'রাজা' না হয়েও ছিলেন রাজকীয়, টমাস ছিলেন রাজার পদবী নিয়েও জৌরুজ জং—মাঠের মানুষ। সৈন্যদের তিনি পেন্সন দিতেন, আহতদের ক্ষতি পূরণ পর্যন্ত। কিন্তু তবুও পের঳-র সৈন্যরা যেদিন তীরের ডগায় আত্মসমর্পণের লোভনীয় প্রস্তাব পাঠায় তাদের কাছে, সেদিন প্রত্যুত্তরে তারা বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যই তৈরি আছে বলে জানিয়েছিল। সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজের অস্থিরতার জন্যেই ১৮০২ সালের ১লা জানুয়ারী অত্যন্ত অগৌরবের মধ্যে অভিযাত্রী পেঁর-র হাতে রাজত্ব এবং দুর্গ ছেড়ে দিয়ে হানসী থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে। সেদিন নিজের টাকশাল, নিজের লুঠের ভাণ্ডার, এমনকি দুর্গের ভেতরে বিশাল হারেমটির দিকেও একবার পেছনে তাকিয়ে দেখবার সময় পাননি টমাস! বোঝা গিয়েছিল; সৈন্যরাই শুধু তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তিনিও মনে মনে হিন্দুস্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তৈরি ছিলেন। নয়ত, এত যুদ্ধে যিনি বীর সৈনিক, —আইরিশ তলোয়ারের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য যিনি একাকী ফরাসী পেঁর-র সৈন্যবাহিনীকে রণে আহ্বান জানাতে পেরেছিলেন—তিনি কি এতগুলো অসহায় নারী শিশুকে শত্রু সৈন্যের হাতে তুলে দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা পকেটে পুরে পরাজিতের মত হানসী ছেড়ে পথে নামতে পারতেন? টমাসের আগেকার জীবন যদি সত্য হয়, তবে মদ খেয়ে খেয়ে বহরমপুরে নয়—আপন প্রজাদের মধ্যে, নিজ দুর্গের দরজায় তলোয়ার হাতে মৃত্যুই ছিল তাঁর স্বাভাবিক মরণ। উপাধি গ্রহণ করে, টাকা বানিয়ে, স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'রাজা' হওয়া সত্ত্বেও টমাস আজ তাই বিস্মৃত নায়ক। গার্ডনারদের খবর তবুও হয়ত কোনদিন আবার উঁকি দিতে পারে কোন উপলক্ষ্যে, কোন না কোন সূত্র ধরে—কিন্তু জর্জ টমাস কোনদিন ফিরবেন না আর। হয়ত, তাঁর জানা ছিল না, শুধু নিজের নামে টাকা বানালেই হিন্দুস্থানে মানুষ মনে রাখে না কাউকে—তার স্থানে অন্য পরিচয়ও চাই। "জৌরুজ

জং' সে পরিচয়ে নিজের হাতেই আরও কালি বুলিয়ে গেছেন সেদিন যেদিন রাজ্যহীন পলাতক বারানসীর ঘাটে ওয়েলেসলির শরণাপন্ন হয়ে জানিয়েছিলেন—তিনি স্বদেশে ফিরতে চান—আয়র্ল্যাণ্ডে। টমাস সেখানে পৌঁছতে পারেননি, কলকাতার পথে গঙ্গামের বহরমপুরেই, ১৮০২ সনে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর শবাধার ঘিরে একটি হিন্দুস্থানীও কেঁদেছে বলে শোনা যায়নি আর! দেশ যার আয়র্ল্যাণ্ড, বাদশাহী যার শুধু টাকশালে—তলোয়ার হাতে না থাকলে তার জন্যে কাঁদা কোন হিন্দুস্থানীর দায়?

কিন্তু যদি কেউ কখনও উত্তর প্রদেশের গঙ্গোত্রী এলাকায় পা দেন এবং হারসিল, ধারালী বা জংগলা গাঁয়ে যদি কোন চাষীর দাওয়ায় দু'দণ্ড বসেন, তাহলে এমন এক আশ্চর্য 'রাজার' কাহিনী শুনতে হবে আপনাকে, যার জন্যে এই প্রজাতন্ত্রের যুগে প্রজারা এখনও কাঁদে। কেউ একটা বিবর্ণ ছবি নিয়ে আসবে, কেউ আঁকা বাঁকা হাতে লেখা কোন দানপত্র, কেউ দু'ঘর পরে পাহাড়িয়া পথের বাঁয়ে যে সুন্দর কাঠের বাড়িটা, একবার সেটি দেখে যেতে অনুরোধ জানাবে। মস্ত রাজত্ব ছিল না তাঁর, রাজধানী ছিল না, ফরমান-সনদেরও বালাইও ছিল না—কিন্তু উইলসন তবুও 'রাজা' ছিলেন। শুধু তেহরী-গাড়ওয়ালের প্রাচীন রাজারা কেন, ইংরেজবাহাদুর—আজকের 'কালেক্টার সাহেব' কেউ তাঁর সমান নন—কেউ তাঁর সমান হতে পারেন না।

উপসংহারে ছোট সেই কাহিনীটা শোনা দরকার। কেননা রাজায় রাজায় ছত্রখান এই দেশে—প্রজারা কেনই বা এত অধীশ্বর মেনে নিতেন, আর কেনই বা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও দিনান্তেই তাঁরা অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে যেতেন—এ কাহিনীটুকু সম্ভবত তারই ইঙ্গিত। এ কাহিনীর নায়ক যিনি তিনিও জন্মসূত্রে আমাদের কেউ ছিলেন না। সিকেন্দরের মত তাঁরও বংশ পরিচয় ছিল না।

সে অনেককাল আগের কথা।

গঙ্গোত্রীর কোন বৃদ্ধই তার সঠিক তারিখ বলতে পারবে না,

ইতিহাসের পাতায় তার কোন নিশানা পাওয়া যাবে না। একদিন হঠাৎ একজন অদ্ভুত দর্শন আগন্তুকের আবির্ভাব হয়েছিল এই গাঁয়ে, মুখবায়। মাথায় তাঁর কটা চুল,—গায়ে লাল রংয়ের কোর্তা, হাতে একটা বন্দুক। গাঁয়ের অধিবাসীরা মানুষটিকে দেখে সন্দেহে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। সাহেব হাত থেকে বন্দুকটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ভাঙা হিন্দীতে জবাব দিয়েছিল—ভয় নেই ভাই সব, আমি মানুষ!

ওরা কথাটা বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করেই হাত ধরে এনে দাওয়ায় বসতে দিয়েছিল, খেতে দিয়েছিল। ওদের সর্দার অভয় দিয়েছিল—পালিয়ে এসেছ ভয় কি?—যদি থাকতে চাও, এ গ্রাম চিরকাল তোমাকে রাখতে রাজী!

উইলসন সেই থেকেই থেকে গেলেন। বৃটিশ বাহিনীর পলাতক সৈনিক আর ছাউনিতে ফিরলেন না, এমন কি অনেকদিন পর্যন্ত সমতলে লোকালয়েও না। তিনি সেই পাহাড়িয়া গাঁয়েই থাকেন, বন্দুক নিয়ে শিকার করেন, গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ঘর করেন। গঙ্গোত্রীর এই এলাকায় আজকের মত তখনও মানুষের ভিড় কম। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার যোগ ঘটে দৈবাৎ—কোন তীর্থ-যাত্রীর দল যদি আসে তবেই। মানুষের চেয়ে তখন সেখানে অনেক বেশী বলবান—প্রকৃতি। চারদিক ঘিরে পাহাড় আর বন, বন-ভরা ফল আর হরিণ। গঙ্গোত্রীর এ অঞ্চলে এরাই স্বাভাবিক জীবন। উইলসন ক্রমে সে জীবনকে বদলাতে মনস্থ করলেন। শিকার করা হরিণের চামড়া নিয়ে একদিন তিনি সমতলের দিকে পা বাড়ালেন। লোকেরা ভাবল—সাহেব বুঝি তবে ফিরেই গেল!

কিন্তু ক'মাস পরে আবার উদিত হলেন উইলসন। এবার পকেট থেকে বের হল তার গাঁয়ে প্রায় অদেখা ধন—টাকা! তারপর থলি থেকে বের হল—আরও আশ্চর্য জিনিস—করাত, হাতুড়ি, ছেনি—আরও রকমারি যন্ত্র। উইলসন জানালেন—শুধু হরিণের চামড়া নয়, এবার আমাদের এই বনকেও কাজে লাগাতে হবে। ওরা তাজ্জব বনে গেল।—কাঠ ত আমরাও চিনি সাহেব, কিন্তু হাজার দেওদার গাছ ক'বছরে কাটবে তুমি, আর কেটে করবেই বা কি?

—হবে! —হবে! উইলসন থলি থেকে এবার উপহারগুলো বের করলেন। গাঁয়ের প্রায় সকলের জন্যই কিছু না কিছু নিয়ে এসেছেন তিনি। মোড়লের জন্যে, মোড়লের মেয়ের জন্যে, সমবয়সী তরুণ বন্ধুদের জন্যে, ছোটদের জন্যে। ওদের আনন্দ আর ধরে না। বুড়ো মোড়ল খুশী হয়ে বলে উঠল, আমি বলছি সাহেব,—তুমি রাজা হবে!

তা-ই হলেন। হারসিল, ধারালি, জংলা এবং গঙ্গোত্রীর আরও আরও গাঁয়ে উইলসন রাজা হলেন। তৎক্ষণাৎ নয়,—যেমন হওয়া উচিত —ক্রমে ক্রমে।

তার নেতৃত্বে বন কাটা শুরু হল। জওয়ানেরা দেওদার কাটে, গঙ্গোত্রীর জলে ভাসিয়ে দেয়। একশ গাছ কাটলে ষাটটাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যে চল্লিশ খানা থাকে তাও কম নয়। উইলসন দেখতে দেখতে ধনী হয়ে উঠলেন। তিনি মুখবা গাঁয়ের পণ্ডিতদের থেকে জমি কিনলেন, গঙ্গার উত্তর তীরে বিরাট খামার গড়ে উঠল তাঁর। তিনি কাশ্মীর আর কুলু থেকে আপেলের চারা আনলেন। নিজের খামারে বিরাট বাগিচা গড়ে উঠল তাঁর। তিনি হারসিলে মস্ত এক কাঠের বাড়ি গড়লেন। লোকের চোখে অতঃপর সেই বাড়িই প্রাসাদ হয়ে উঠল এবং ক'বছরের মধ্যে উইলসন মুখবা গাঁয়ের উইলসন রাজা হয়ে গেলেন। তাঁর অনেক অর্থ, বিরাট প্রাসাদ। আশপাশে গ্রাম ভরা তাঁর প্রজা। আশ্চর্য এই, যাঁর রাজত্বে উইলসনের এই নয়া জমানা চালু হয়েছে—সেই তেহরি গাড়ওয়ালের রাজা তখনও সে খবর রাখেন না, ইংরেজরা অনেক দূরে, তাঁদের ত খবরাখবরের প্রশ্নই উঠে না!

উইলসন শুধু রাজা হলেন না—সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল তিনি রাজার মত রাজা। চার গাঁয়ে ছয় ছয়টি ঘরের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ করলেন, কিন্তু হারসিলের কাঠের প্রাসাদকে হারেম করলেন না। যাঁর ঘরের মেয়ে নিয়েছেন তিনি, তার বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন তাঁর দ্বিতীয় প্রাসাদ, পত্নীরা সেখানেই থাকবেন। বঙ্গের সাবেকী কুলীনদের ঢঙে উইলসন পালা করে সেখানে বাস করতেন।

ক্রমে রাজধানী, হারসিন গাঁয়ের কাঠের প্রাসাদ রাজার দরবারে পরিণত হল। প্রজারা আসে, রাজার কাছে বিচার চায়। একদিন একটি মেয়েকে নিয়ে এল দু গাঁয়ের মরদ, পেছনে পেছনে দল বেঁধে দুই গাঁয়ের মানুষ। একদল বলছে এই মেয়েটিকে আমরা নিজেদের গাঁয়ে রাখব, আমাদের গাঁয়ের ছেলের সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। অন্যদল বলছে, না তা হবে না, আমরা আমাদের গাঁয়ের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চাই। মেয়েটির চোখের দিকে তাকালেন রাজা বাহাদুর, আচ্ছা, তুমিই বল কার সঙ্গে যাবে?

—কারও ঘরে না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বন্য পাহাড়িয়া মেয়ে।

—তবে?

—আমি তোর ঘরেই থাকব রাজা!

উইলসন বললেন—বেশ, তবে তাই হক!

বিচারসভা তক্ষুনি শেষ হয়ে গেল। প্রজারা খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। যেতে যেতে তারা একবাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ,—রাজা বটে উইলসন।

এ মেয়েকে বাপের বাড়ি রাখা যেতে পারে না। নিয়মভঙ্গ করে উইলসন এবার মুখবার প্রাসাদের সঙ্গেই একটা অন্দরমহল জুড়লেন,—রাজধানীতে সংসার পাতলেন। প্রজারা ধন্য ধন্য করে উঠল।

শুধু বিচার নয়, উইলসনের প্রাসাদে দিন রাত্রির দরবার। কোন গাঁয়ে হয়ত ভালুক নেমেছে, এক্ষুনি বন্দুক হাতে সেখানে ছুটতে হবে,—কেউ হয়ত কি এক অজানা অসুখে কাতরাচ্ছে তাকে ওষুধ দিয়ে আরাম করতে হবে। উইলসন শুধু শাসক নন, তিনি রাজত্বের প্রহরী, তিনি বিচারক, চিকিৎসক। একমাত্র অভাব ছিল—নিজের টাকশালের। প্রজাদের মত নিয়ে উইলসন একদিন তাও চালু করে দিলেন। তাঁর নাম নিয়ে—গঙ্গোত্রীর পাঁচখানা গাঁয়ে মুখবার শ্বেতাঙ্গ রাজার টাকা চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে হিমালয়ের কোলে—নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপূর্ণ একটি রাজত্বও।

বর্হিজগতের অগোচরে প্রায় অর্ধশতক চলেছিল এই রাজত্ব। কেউ কোন খবর রাখত না তার। কিন্তু একদিন উইলসনকে নিজেই সে খবর নিয়ে ছুটতে হল—তেহরী গাড়ওয়ালের রাজার কাছে। কেননা, তিরিশ বছরের যুবক এখন পঁচাশী বছরের বৃদ্ধ, কোনদিন নিজ রাজত্বে কেউ সম্মান আর ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু দেয়নি তাঁকে, কিন্তু নাথু হয়ত সব গোলমাল করে দেবে—সসম্মানে শান্তিতে মরতে দেবে না তাঁকে।

বিচার সভায় বসে রায় দিতে গিয়ে পাওয়া সেই মেয়েটি দুই পুত্র সন্তান দিয়েছিল উইলসন সাহেবকে। একজনের নাম নাথু সাহেব, অন্য জনের নাম চার্লস সাহেব। চার্লস অনেকটা বাবার মত। নম্র, শান্ত, ভদ্র। কিন্তু নাথু যেন—কালাপাহাড়। সে হিন্দু প্রজাদের উপর যা তা অত্যাচার করে বেড়ায়। কোনদিন মন্দির ভাঙছে, কোনদিন দেব প্রতিমা, কোনদিন কোন হিন্দু কন্যার সম্ভ্রম হানি করছে। প্রজারা চোখে জল নিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু উইলসন এখন অক্ষম রাজা। তিনি বন্দুক ধরতে পারেন না। তাছাড়া চোখেও তত ভাল দেখেন না। অথচ এটা বোঝেন —এ অবস্থায় চলতে দেওয়া যায় না।

সুতরাং, প্রজাবৎসল 'রাজা' উইলসন একদিন রাজ্যত্যাগী হলেন। তিনি তেহরী গাড়ওয়ালের মহারাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজা কোনদিন এ 'রাজার' কথা শোনেন নি। সব শুনে তিনি মুগ্ধ। উইলসনকে সাদরে বসিয়ে তিনি বললেন—বল সাহেব, কী আমি করতে পারি!

—রাজার যা কর্তব্য! উইলসন কম কথায় বক্তব্য শেষ করলেন। —আমি তোমাকে আমার প্রাসাদ, আমার রাজত্ব, আমার প্রজাবর্গ সব দিয়ে গেলাম; এবার যা কর, সে তোমার কর্তব্য!

গাড়োয়াল থেকে উইলসন নিঃশব্দে এবার সমতলের দিকে পা বাড়ালেন। কেউ আর কোনদিন দেখতে পায়নি তাঁকে। উইলসন নামে কোন সাহেব —কোন গঞ্জ বা ক্যাণ্টনমেণ্টে অসহায়ের মত মারা গিয়েছেন কিনা সে খবরও পাওয়া যায়নি কোনদিন। তেহরী গাড়ওয়ালের রাজা বাহাদুর মুখবা গাঁয়ে দখল নিতে গিয়ে শুনলেন—যার জন্যে গৃহত্যাগী হয়েছেন এ

গাঁয়ের 'রাজা' সেই নাথুকে আর শাসন করবার দরকার নেই, সে পাগল হয়ে গেছে। সাহেবের আর এক ছেলে চার্লস চলে গেছে মুসৌরীর দিকে —সে নাকি ব্যবসা করবে!

ক্রমে তারাও হারিয়ে গেল। আগ্রার এক উন্মাদ আশ্রমে নাথু শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। চার্লস-এর ব্যবসা "চার্লিভিল" নামে মুসৌরীর হোটেলটিও একদিন বাড়ির নামে এসে ঠেকল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া 'রাজা' উইলসন তবুও মুছে গেলেন না গঙ্গোত্রীর জলে।

সিকেন্দরের মত, 'জোরুজ জং'এর মত গার্ডনাদের মত—সোনার জলে ছাপানো বৃটিশ রাজত্বের মোটামোটা ইতিহাস বইগুলোতে তাঁর কথাও নেই। থাকলেও ক্লাইভ-হেস্টিংস, লরেন্স-ডালহৌসির 'বাদশানামা'গুলোর পাতায় নয়, তার থেকে বহুদূরে—কোন ভ্রমণকারী, হয়ত বা কোন রেভিন্যু অফিসারের ডেসপ্যাচে, ইতিহাস নয় যে বইগুলো তার পাতায়। অথচ আজও যদি কেউ উত্তর প্রদেশের তহশীল গঙ্গোত্রীর সেই এলাকায় পা দেন —তবে মুখে মুখে শোনা যাবে মুখবার মুকুটহীন রাজা উইলসনের কাহিনী। আগাগোড়া দেওদার কাঠে গড়া হারসিলের যে ডাকবাংলোটায় বসে এ কাহিনী শুনবেন আপনি, এক সময় শুনতে পাবেন—এই বাংলোটাই ছিল 'রাজা' সাহেবের প্রাসাদ,—উইলসনের রাজধানী। সরকারী আপেলের যে ডালিটি মাথা থেকে বারান্দায় নামাবে হারসিলের দেওয়ালী, শুনবেন, এ আপেল আজ উত্তর প্রদেশ সরকারের হলেও বাগানটা ছিল উইলসনের। উইলসনের নাম শুনেই সদ্য বাগান ফেরত মেয়েটি হঠাৎ চমকে উঠে নিজের বুকের দিকে তাকাবে—গলার-মালাটায় আলতোভাবে হাত বুলবে। যদি নির্লজ্জের মত তাকাতে পারেন সেদিকে, তবে দেখবেন,—ওর বুকে জ্বল জ্বল করছে কতকগুলো রুপোর চাকতি, তার প্রত্যেকটিতে উইলসনের ছবি! উইলসন ওদের গহনা,—বুকের অলঙ্কার। শুধু গহনা নয়, জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় মাথা নিচু করবে, তারপর খিল খিল করে হেসে বলে উঠবে—এ সাহেব দেওতা, তাঁর তসবিরে যাদু আছে, ভূত পেত্নী দূরে থাকে—ঠিক মত্ মাহিনা মিলে!

ছত্রিশ বছর এদিকে আছেন। জীবনে টাকা পয়সাও যে কম লুটেছেন এমন নয়। কিন্তু তবুও মৃত্যুর পর ওর উইল খুলে গোটা হুগলী তাজ্জব হয়ে গেল। নিকট অথবা দূর—কাউকে কিচ্ছু দিয়ে যাননি মানুষটি। শুধু পনের হাজার একশ টাকা রেখে গিয়েছেন খুশী খাঁর ভরণপোষণের জন্যে। খুশী খাঁ ওর কোন প্রিয় খানসামা কিংবা মুনশী নয়,—নেহাৎই একটি চতুষ্পদ। খুশী খাঁ ওঁর প্রিয় ঘোড়াটির নাম। কি করে তার খাবার তৈরি করতে হবে, কখন এবং কিভাবে তা পরিবেশন করতে হবে, আগাগোড়া উইল সে-সব খুঁটিনাটিতে বোঝাই। তার বাইরে সেখানে অন্য কোন দান অথবা ধ্যানের কথা নেই।—কি বলা যায় ওঁকে?—'নাবব?' সমসাময়িকরা মাথা ঝেঁকেছিলেন,—হুগলীর জন হোম আসলে একটি আস্ত পাগল!

'নাবব' অন্য কাহিনী। শুধু সিংহাসনে বসলেই যেমন কেউ সত্যিকারের রাজা হয় না, তেমনি শুধু দান খয়রাতেও কেউ 'নাবব' হয় না। এমন কি সিন্দুকের সর্বস্ব আস্তাবলের কোন ঘোড়ার নামে লিখে দিয়ে গেলেও না। কখনও দান, কখনও পরকিয়া ধ্যান, কখনও প্রবল বিলাসিতা কখনও বা শহরের এককোণে ওয়াচ-টাওয়ার বা রাজকীয় পাগলাগারদের ছেঁড়াকাঁথা—'নাবব' কার্যত অনেকটা আমাদের বহু চেনা নবাবেরই মত। সেই উদ্দামতা, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং অবশেষে সেই অসহায়তা! 'নাবব' নবাবেরই মত এক বিচিত্র:অস্তিত্ব।

যথা: শ্রীমান বব পট। শুধু শ্রীমান নয়,—পট পাত্র হিসেবে যথেষ্ট ধীমানও ছিলেন। তিনি বিলেতের রীতিমত এক খনাদানী ঘরের সন্তান। পিতৃপুরুষ তাঁর জাহাজের কারবারী ছিলেন। ফলে পটকে আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে উঠতে হয়নি। কলকাতায় তিনি বেকার অবস্থাতেও

একজন যথার্থ 'আগুন্তুক' বলে গণ্য হয়েছিলেন। বিশেষত কানাঘুষায় সবাই জেনে ফেলেছিলেন—ওঁর পকেটে যে সুপারিশপত্রটি রয়েছে তাতে সই দিয়েছেন আর কেউ নন, তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের মাননীয় লর্ড চ্যান্সেলার থার্লো স্বয়ং! স্বভাবতই পট অনেকদিন বেকার ছিলেন না। কোন 'নাবব'ই তা থাকেন না, স্বেচ্ছায় কখনও কখনও ওঁরা গদীত্যাগ করেন মাত্র। নাবব-পটও তাই করতেন। নিজের হেড-অ্যাসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি চাকরী খুইয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে হিন্দুস্থান-প্রবাসী যে কোন প্রকৃত সাহেবের কাছে সেটা হয়ত তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যার পক্ষে প্ররোচনা হিসেবে যথেষ্ট, কিন্তু পট 'নাবব'। তিনি জানেন—এদেশের নবাবেরা সাধারণত তাঁদের অধস্তন উজীর নাজির ইত্যাদির সক্রিয় উদ্যমের কাছেই সিংহাসন খুইয়ে থাকেন। সুতরাং, আশু বেকারত্বের দুশ্চিন্তা যাতে তাঁর ধারকাছ না ঘেঁষতে পারে সেই চেষ্টায় নাবব-পট তৎক্ষণাৎ একটি রূপসী মেয়েকে যথোপযুক্ত জাঁকজমক সহকারে তাঁর ঘরে তুলে নিয়ে এলেন। মেয়েটি তৎকালের কলকাতার অন্যতম এলিজিবল-কুমারী সুখ্যাত মিস-ক্রুটেনডেন। পটের ঘরে তিনিই প্রথম হুরী নন,—তাঁর আগে ছিলেন এমিলি ওয়ারেণ নামে আর একজন তরুণী। এমন কি মহিলারা নাকি পর্যন্ত স্বীকার করতেন মেয়েটি সুন্দরী। তিনি গরমের দেশে ঠাণ্ডা থাকার বাসনায়—দিনরাত ঠাণ্ডা দুধ আর জল খেতে খেতে একদিন এমন ঠাণ্ডাই হয়ে গেলেন যে, বেচারা পট তাঁকে শেষ পর্যন্ত কুলপীতেই মাটি চাপা দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাববের প্রথম রাজত্ব সেখানেই ছিল। দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের সময় পট শুধু রাজ্যহীন নন,—কার্যত কপর্দকহীন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত কোন চাকরী ছিল না তাঁর। তাহলেও পট কোন বিলাস-প্রস্তাবে কোনদিন বারেক পেছনে অথবা সামনে তাকিয়েছিলেন—এমন কোন সংবাদ নেই! কেননা, পট 'নাবব' এবং মুর্শিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেণ্ট হিসেবে তিনি জেনেছিলেন—সাচ্চা নাববের জীবনে বর্তমান. ছাড়া কোন কাল নেই। আগে দু'জন পেছনে দশজন ঘোড়সওয়ার সাজিয়ে ফিটন হাঁকিয়ে শহর থেকে আফজলবাগে

রেসিডেন্সি প্রসাদে ফিরতে ফিরতে রেসিডেণ্ট সাহেব যখন পথের ধারে বসে থাকা ব্রাহ্মণ ভিখারীটিকে লক্ষ্য করে একটি আস্ত টাকা ছুঁড়ে দিতেন —তখন ধন্যবাদের বদলে লোকটি চিৎকার করে কি বলত কৌতূহলী পটের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। অনেক দিন তিনি লাগাম টেনে গাড়ি থামিয়েছেন। দোভাষী লাগিয়ে কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করেছেন। দোভষী অনুবাদ করতে গিয়ে মনে মনে শিউরে উঠেছে। জিভ কেটে, মাথা চুলকে, নানারকম ভণিতা করে সে বলতে চেয়েছে—হুজুর লোকটি আপনাকে নবাব বলেছে! সে যা বলছে তার মর্ম: ওরে বিলিত বাঁদর!·· ওরে নবাব রে! এত বড় আস্পর্ধা তোর যাবার সময় ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে একটা ময়লা টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছিস!···আরে বিলিতি বাঁদর, আমাকে টাকার গরম দেখচ্ছিস!···ইত্যাদি। রেসিডেণ্ট তবুও যথারীতি টাকাটি ছুঁড়ে যেতেন। কেননা, বব-পট মেজাজে যথার্থ ই 'নবাব' ছিলেন।

মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্টের চাকরীটা পট যে ভাবে জোগাড় করেছিলেন —সেও একই 'নবাবীর কাহিনী—যেন ছোটমাপের কোন এক মীরজাফর ছোট কোন সিংহাসনের বন্দোবস্ত খুঁজছেন। সে ১৭৮৩ সনের কথা। থার্লোর সুপারিশ বিফল হয়নি। কোম্পানির ডিরেক্টররা বব পটকে মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্টের আসন দিতে সম্মত হয়েছেন। পদটা শুধু সম্মানের নয়, যথেষ্ট অর্থকরীও। 'প্যাগোডা-ট্রি' বা টাকার-গাছ সেখানে বারোমাস ফুল ফল আনত। মাইনে নামক প্রধান কাণ্ডটি ছাড়া সে বৃক্ষে রোজগারের শাখাপ্রশাখা অজস্র। প্রথমত কোম্পানির তরফ থেকে নবাবকে যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তা রেসিডেণ্টের হাত হয়ে যায়, ফলে—সেখানে কিছু না কিছু লেগে থাকার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, রেসিডেন্সির মাধ্যম ছাড়া নবাবের বোতল সোডাপানি কেনবারও কোন অধিকার নেই। তাঁর হয়েই রেসিডেণ্ট প্রাসাদের সব সওদা করে থাকেন। সে পথেও বিলক্ষণ রোজগার। স্বভাবতই পট পদটির প্রতি যারপরনাই আসক্ত হয়ে উঠলেন। মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্ট তখন স্যার জন ডয়িলি। তাঁর সে বছরই অবসর গ্রহণের কথা। সে কথা ভেবেই কোম্পানি পটকে

কাজটি দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু ছেলেটির উৎসাহ দেখে ডয়িলি বেঁকে বসলেন। তিনি জানালেন, ইচ্ছে করলে অনায়াসে তিনি আরও দু'এক বছর কাজটা চালিয়ে নিতে পারবেন। বেগতিক পট—তাঁর কাছে প্রস্তাব দিল মিছিমিছি কেন আর আপনি কষ্ট স্বীকার করবেন,—তার চেয়ে সেই ভাল নয় কি, চাকরীটাও ছেড়ে দিলেন অথচ আপনার কোন লোকসান হল না!

ডয়িলি জানতেন—পট এ প্রস্তাবই দেবে। কেননা তিনি যতদূর জেনেছেন, ছেলেটা প্রকৃতিতে 'নাবব'। তিনি রেসিডেণ্টের আসনের দাম ঘোষণা করলেন—তিন লক্ষ সিক্কা টাকা! পকেটে খাস কোম্পানির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, পট তবুও পিছ পা হলেন না, তিনি তিন লক্ষ টাকার বিনিময়েই রেসিডেণ্ট হলেন। ডয়িলি বললেন—আমার ফার্নিচারগুলোও তোমাকে কিনতে হবে। তার দাম ধার্য হল—নব্বুই হাজার টাকা!—বেশ, তাই দেব। পট আসবাবগুলো সব কিনলেন, কিন্তু একটাও ব্যবহার করলেন না। নতুন করে নিজের পয়সায় তিনি রেসিডন্সি সাজালেন। এমন কি বাড়িটা পর্যন্ত নতুন করে নিজের পছন্দমত করিয়ে নিলেন! তার তবুও একটা অর্থ হয়, কেননা পদটা অর্থকর। কিন্তু তার কিছুদিন আগে পট বর্ধমানে যা করেছিলেন তা আরও বিস্ময়কর। মাত্র কিছুদিন থাকবেন জেনেও তিনি তাঁর সাময়িক আস্তানাটিকে পছন্দমত করতে গিয়ে সজ্ঞানে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। তাই বলে কি পট উন্মাদ ছিলেন? অবশ্য নয়। তিনি 'নাবব' ছিলেন। মুর্শিদাবাদে তাঁর যেমন ষাটজন অশ্বারোহীর 'গার্ড' ছিল, তেমনি প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার টেবিলে তাঁর নিমন্ত্রিত থাকত কমপক্ষে তিরিশ জন! 'নাবব'-পট তখন বন্ধুদের 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে,' কলকাতায় হিন্দুস্থানী তরুণী উপহার পাঠাচ্ছেন, দরকার হলে বন্ধুর ইজ্জৎ রক্ষার্থে পিস্তল হাতে ডুয়েলে অবতীর্ণ হচ্ছেন! তাঁর তুল্য 'নাবব' আমাদের নাবব-তরঙ্গিণীতেও বোধহয় রাশি রাশি নেই।

পট তবু ঘর সাজাতেন নিজের জন্যে। কিন্তু তস্য বান্ধব হিকি?

১৭৯৬ সনের কথা। সেদিন যদি কেউ ডাচ গভর্নরের বাড়ি দেখবেন বলে কোন জানুয়ারীর সকালে চুঁচুড়ায় আসতেন, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন লাট মহোদয়ের বাড়ির পাশেই পার্কের গা ঘেঁয়ে নদী থেকে মাত্র একশ গজ দূরে সুন্দর একটি বাংলো গড়ে উঠছে। বাঙ্গালী আর্কিটেক্ট আর পশ্চিমী মুনিষেরা এমন তাড়াতাড়িতে কাজ করে চলেছেন যেন দেশের এ কয় বিঘা জমিতে হঠাৎ আপৎকালীন অবস্থা বলবৎ হয়ে গেছে। তাঁরা সেদিন জানতেন না, সাহেব হঠাৎ কেন এই বাড়িটি নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। সেদিনের চুঁচুড়ার পথচারী-প্রতিবেশীদেরও তা জানবার কথা নয়। কিন্তু বিশ্ব আজ জানে—হিকির এই ব্যস্ততার এক-মাত্র কারণ যিনি তিনি—জমাদারনী। জমাদারনীর মনোরঞ্জনের বাসনায় হেস্টিংস-এর কলকাতার বিখ্যাত এটর্নি উইলিয়াম হিকি ইতিপূর্বে অনেক নাববোচিত আচরণ করেছেন। কলকাতার গ্রীষ্ম থেকে একটি হিন্দুস্থানী রমণীর দেহচর্মের কোমলতাকে রক্ষা করার বেপরোয়া চেষ্টায় গরমের দিনে তিনি চৌরঙ্গী ছেড়ে গার্ডেনরীচ-এর শহরতলীতে প্রাসাদ সাজিয়েছেন। তাতেও আশানুরূপ হাসি ফোটাতে না পেরে, তিনি স্ব-বান্ধবী নৌকো নিয়ে গঙ্গায় প্রমোদভবনে বের হয়েছেন। ভাসতে ভাসতে চুঁচুড়ার উপকূলে এসে জমাদারনী স্মিত হাস্যে যেই না বলল, এই জায়গাটা মন্দ নয়, সাহেব অমনি ডাঙায় লাফিয়ে পড়লেন। চুঁচুড়াতে বাড়ি ভাড়া করা হল। হয়ত সেভাবেই আরও কিছুদিন চলে যেত। সাহেব শনিবারে শনিবারে চুঁচুড়ার কর্তব্য সেরে কলকাতার কৃত্যগুলো মেসের কেরাণীর কায়দায় কোনমতে চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল—হয়ত তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। এমতাবস্থায় প্রকৃত 'নাবব' হিসেবে জমাদারনীর প্রতি কর্তব্য তাঁর সুস্পষ্ট। তিনি আর্কিটেক্টের কাছে তৎক্ষণাৎ প্ল্যান তলব করলেন। জানুয়ারীতে ভিত পড়ল, প্রাসাদ জুনে সমাপ্ত। চুঁচুড়ার সেই বাড়িটির এই ইতিহাস। সেদিন যে বাড়িটি দেখে চুঁচুড়ার লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন, সেটি আসলে জমাদারনীর বাড়ি।

নগদ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে বিদেশী 'নাবব' যে মেয়েটির জন্যে এমন করে ঘর সাজিয়েছিলেন, বলা নিষ্প্রয়োজন, তার সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর 'নাববী' কায়দায়। হিকির নিজের ভাষায়ঃ আমার আইরিশ' অতিথি কার্টার লিভারের অসুখে পড়েন। তিনি স্থির করেন, কলকাতায় আর না তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবেন। কার্টার যখন আমার বাড়িতে থাকতেন তখন একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে তার কাছে আনাগোনা করত। মেয়েটি সুন্দরী। তাছাড়া বেশ চালাকচতুর। কার্টার চলে যাওয়ার পর আমি তাকে বললাম—আমার কাছে থাকবে? সে বেশ খুশী মনেই সম্মতি জানাল।

সেই মেয়েটিই হিকির স্বনামধন্য জমাদারনী। সাহেব যখন চুঁচুড়ায় বান্ধবীকে নিয়ে নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ করছেন, তার মাস দুই আগে—জমাদারনী সহাস্যে তাঁর কানে কানে নিবেদন করেছে—অচিরেই তাঁর ঘরে একজন 'ছোটা উইলিয়াম সাহেব' আসছেন। কি বয়সে, কি বিত্তে—হিকি তখনও পড়ন্ত 'নাবব' নন, সুতরাং তাঁর পলায়নের কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

'নাবব' এবং সাচ্চা নাবব বলেই সম্ভবত হিকি তাঁর জমাদারনী এবং তার গর্ভের সন্তান 'ছোটা উইলিয়াম সাহেবের' অকাল মৃত্যুতে সোচ্চারে কেঁদেছেন এবং বিনা ভণিতায় তাঁর স্মৃতিকথায় কিরণবালা উপাখ্যান বিবৃত করে যেতে পেরেছেন।

বন্ধু পট মুর্শিদাবাদ থেকে 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' তাকে যে উপহারটি পাঠিয়েছিলেন কিরণ তারই নাম। এই মেয়েটিও রূপবতী ছিল। বছরখনেক তাকে নিয়ে ঘর করার পর সাহেব কুঠিতে যথারীতি একটি 'ছোটা উইলিয়াম' সাহেবের আবির্ভাব ঘটল। হিকি তাতে যে খুব উদ্বিগ্ন বা অখুশী হয়েছিলেন এমন নয়। কিন্তু যখনই ছেলেটির ঘনকৃষ্ণ চুল এবং আবলুসপ্রায় দেহবর্ণের কথা ভাবেন, তখনই তাঁর মনটা বাকি খারাপ হয়ে যেত। অবশেষে সেই রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হল। প্রভু অসময়ে বাড়ি ফিরে কাকের বাসায় কোকিল আবিষ্কার করলেন। সন্দেহ

ভঞ্জন হল। 'ছোটা উইলিয়ামের প্রকৃত জনক হিজ হাইনেস খিদমৎগারজী এবং মাদাম তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হল। ইচ্ছে করলে অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় খানদানী নাবব উইলিয়াম হিকির পক্ষে দিল্লি-লাহোর, মুর্শিদাবাদ-ঢাকার নবাবী ন্যায়ের পুনরাবৃত্তি মোটেই অসম্ভব কিছু ছিল না, কিন্তু 'নাবব' হিকি সে পথে গেলেন না। তিনি মহানুভব নাববের আচরণ করলেন,—ওদের বিদায় দিয়ে দিলেন। স্মৃতিকথায় আরও বিস্ময়কর খবর : "পরে যখন শুনলাম, কিরণ দুঃখে পড়েছে তখন তার জন্যে একটা মাসোহারার বরাদ্দ না করে পারলাম না।"

শুধু এই জমাদারনী আর কিরণ নয়,—'নাবব হিকির একই কাহিনী কলকাতায় তাঁর প্রতিদিনের জীবনে। একা মানুষ,—কত বাড়ি বদল আর ফার্ণিচার করেছেন তার হিসেব নেই। সংসারে স্ত্রী শার্লত-এর মৃত্যুর পরে আপন বলতে কেউ ছিল না, কিন্তু ভৃত্য ছিল তেষট্টিজন। সেকালের মাপে এই ভৃত্যবহরও হয়ত বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা, ম্যাকবেরী লিখেছেন—স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের চারজনের সংসার দেখা-শুনার জন্যে বেয়ারা খিদমৎগার ছিল একশ' দশজন। হেস্টিংস যখন উত্তর ভারত পরিক্রমায় বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর সহচর ছিল পাঁচশ' মানুষ, —পরবর্তীকালে (১৮৩৯) লর্ড অকল্যাণ্ডের ভারতদর্শনের সঙ্গী ছিল বারো হাজার তবে ওঁরা সরকারী মানুষ। এটর্নি হিকি তা নন। কিন্তু তাহলেও অন্তত ভৃত্য বিলাসিতায় তিনি যে যে-কোন লাটবাহাদুরের চেয়ে বড়সাহেব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোন উপায় নেই। তার ভৃত্য মনিবের পকেট থেকে নিয়মিত ভাবে মোহর সরায়,—কিন্তু তবুও তিনি তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। ওরা অত্যাচার করে, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে—নাবব তবুও নির্বিকার। শুধু নির্বিকার নয়,—১৮০৮ সনে কলকাতা থেকে বিদায় দিনে তেষট্টি ভৃত্যের প্রত্যেককে তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই তেষট্টির পাঁচজন আবার তাঁর নিজের নয়,—গোলাপ আর টিপি নামে তাঁর দুই দাসীর। হিকির চূড়ান্ত জমাখরচে দেখা যাচ্ছে—গোলাপদাসীর জমি ও বাড়ি বাবদে দিচ্ছেন

তিনি—তিন হাজার পাঁচশ' চব্বিশ টাকা, টিপির জন্যে ওই খাতে খরচ করেন—দেড় হাজার টাকা!

যদি বলেন—এ 'নাবব' সঠিক নবাব নয়, একজন বিলাসী 'বাবু' মাত্র, তাহলে সমসাময়িক 'নাবব'দের মধ্যে স্বনামধন্য 'নাবব' রিচার্ড বারওয়েল সাহেবের কাহিনীটাও একবার শোনা দরকার। বারওয়েল পদাধিকারে মস্ত মানুষ। তিনি গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ঘনিষ্ঠ বান্ধব এবং তাঁর কাউন্সিলের একজন মাননীয় সদস্য। তদুপরি তিনি একজন 'কমপিটিশনওয়ালা' তথা ব্যবসায়ীও বটেন। ঢাকায় তাঁর দু-দুটি নুনের আড়ত ছিল। সেগুলো আর্মেনিয়ানদের কাছে ইজারা দিয়ে তিনি বিস্তর পয়সা লুটেছিলেন। দৈনন্দিন জীবন তাঁর আর পাঁচজন প্রতিবেশী 'নাববের' মতই ছিল। উইলিয়াম ম্যাকিনটসের বিবরণ অনুযায়ী কলকাতার সে 'নাববী' গৃহস্থালীর পরিচয়:

সকাল সাতটা নাগাদ দরোয়ান নাবব বাহাদুরের গেট খুলে দিল। নিমেষে বারান্দাটি সলিসিটার, রাইটার, সরকার, পিওন, হরকরা, চোপদার হুঁকাবরদার ইত্যাদিতে ভরে গেল। বেলা আটটায় হেড বেয়ারা এবং জমাদার প্রভুর শোবার ঘরে প্রবেশ করবে। একটি মহিলাকে তখন শয্যা ত্যাগ করে একান্তে প্রাইভেট সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে দেখা যাবে, অথবা বাড়ির অঙ্গন পরিত্যাগ করতে। নাবব বাহাদুর খাট থেকে মাটিতে পা রাখামাত্র অপেক্ষমান ভৃত্যবহর তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে পড়বে। তারা আনত মাথায় পিঠ বাঁকিয়ে প্রত্যেকে তিনবার করে তাঁকে সেলাম জানাবে। ওদের হাতের একদিক তখন কপাল স্পর্শ করবে, উল্টো দিকটা থাকবে মেঝেতে। তিনি মাথা নেড়ে অথবা দৃষ্টিদানে তাদের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি জানাবেন।...

'নাবব' এবার পোশাক পরবেন। অবশ্য সেজন্যে তাঁকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। ওরাই সব করে দেবে। তিনি যেন কোন মর্মরমূর্তি। 'ছোটাহাজিরা' বা প্রাতরাশের ঘরে টেবিলে চা আসবে। 'নাবব' সেখানে গিয়ে বসবেন। তিনি কখনও চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, কখনও হুঁকোর নল মুখে

তুলে দিচ্ছেন। হেয়ার ড্রেসার তাঁর কেশবিন্যাস করছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে 'নাবব' অভ্যাগতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের মধ্যে সম্মানিত কেউ থাকলে, তিনি তাঁকে চেয়ারে বসতে বলছেন। এই অনুষ্ঠান বেলা দশটা পর্যন্ত চলবে। মহাশয় অতঃপর সদলবলে তাঁর পাল্কীটির দিকে এগিয়ে যাবেন। আগে পিছে আটজন থেকে বারোজন চোপদার হরকরা ইত্যাদি ছুটবে, তিনি দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাবেন। বেলা দুটোয় তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। তখন টেবিলে গ্রাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুঁকো হাতে হুঁকাবরদারের দল আসরে ঢুকবে। মহিলারা উপস্থিত থাকলেও কোন বাধা নেই। অতিথিদের হাতে হাতে নল তুলে দিয়ে তারা সার বেঁধে পেছনে দাঁড়াবে—আগুন যাতে মুহূর্তের জন্য নিবে না যায় সেদিকে নজর রাখবে···

ভোজসভা শেষ হবে বেলা চারটায়। 'নাবব' অতঃপর শুধু শার্টটা গায়ে রেখে বাদ বাকি সব পোশাক খুলে ফেলবেন। এবার তিনি আবার শয্যা নেবেন। সাতটা কিংবা আটটা অবধি তাঁর বিশ্রাম চলবে। ঘুম থেকে ওঠামাত্র আবার সকালের সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি শুরু হবে, দেহে তাঁর আর একপ্রস্থ পোশাক উঠবে। সান্ধ্য চায়ের পর তিনি একটি মনোরম কোট পরবেন এবং ভদ্রমহিলাদের সন্দর্শনার্থে বের হবেন। রাত্রি দশটায় সাপার। দশটার কিছু আগে তিনি আবার ঘরে ফিরে আসবেন। এবারকার ভোজের আসর শেষ হবে রাত বারোটা কিংবা একটায়। অতিথিরা চলে যাওয়ার পরে আমাদের নায়ক তাঁর শোবার ঘর অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে একজন সহচরী অপেক্ষা করে আছেন। ······ইত্যাদি।

যদিও ম্যাকিনটস তাঁর বিবরণে 'নাবব' শব্দটি ব্যবহার করেননি, তাহলেও বলা নিষ্প্রয়োজন এ রোজনামচা প্রকৃত 'নাবব' ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 'নাবব' বারওয়েলের দৈনন্দিন জীবন, এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কিছু হওয়ার কথা নয়। তবে সমস্ত কর্মসূচীতে তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত স্পর্শ অবশ্যই ছিল। বারওয়েল জুয়া খেলতে ভালবাসতেন।

একবার এক আসরেই ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর কাছ থেকে কুড়ি হাজার পাউণ্ড জিতেছিলেন। বারওয়েল আর এক আসরে হেরেছিলেন—চল্লিশ হাজার পাউণ্ড! তাছাড়া বারওয়েলের আর এক নেশা ছিল ভোজসভা। ভোজসভা তথা খানাপিনা তখন 'নাববে'র নবাবীয়ানার অন্যতম অঙ্গ। প্রমাণ সাইজের 'নাবব' মানেই—তাঁর প্রাতরাশের টেবিলে থাকবে তিরিশজন, মধ্যাহ্নভোজে পঞ্চাশজন। রাত্রির খাওয়া হবে মধ্যরাতে এবং নাচ চলবে ভোর পর্যন্ত। বারওয়েল তার পরেও প্রতি পনের দিন অন্তর বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে টেভার্নে আসর বসাতেন। মাদাম গ্রাণ্ডের ঘরে যেই সহ ফ্রান্সিস যেদিন ধরা পড়েন মিঃ গ্রাণ্ড সেদিন সে নেমন্তন্ন রক্ষা করতেই বাড়ি খালি রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু ভোজদাতা হিসেবে নয়, নাববী-কলকাতায় যে কোন ভোজের আসরে 'নাবব' বারওয়েল ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। চার গজ দূর থেকে এক ফুঁয়ে তিনি যে কোন মোমবাতি নিবিয়ে দিতে পারতেন। সেকালে ভোজের আসরে আর একটি 'নাববী' আচার ছিল 'পেল্টিং' বা রুটি-মাংস ছোঁড়াছুড়ি। সেই কদর্য ক্রীড়ায় এমন কি বিবিসাহেবেরা পর্যন্ত মত্ত হতেন। তবে কারও মুখ বা মাথা লক্ষ্য করে মুর্গীর ঠ্যাং ছুঁড়ে মারার বদলে সুরসিকা এবং কোমলহৃদয়া মেয়েরা মিঠাই প্যাস্ট্রি ইত্যাদি মধুর লোষ্ট্রাদিই পছন্দ করতেন বেশী। কেননা, তৎকালে সেটিই ছিল রসবোধ এবং কালচারের লক্ষণ! বারওয়েল এ ব্যাপারেও বলতে গেলে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর হাতের টিপ কখনও বিফল হত না। তার চেয়েও বড় কথা, চোখের টিপেও 'নাবব' বারওয়েল ছিলেন তেমনি—অব্যর্থ! ক্লাইভ নিজে বলেছেন—'দি ওনলি কোয়ালিফিকেশন অব মিস্টার বারওয়েল আই নো অব, ইজ হ্যাট হি ইজ এ গুড সিডিউসার অব ফ্রেণ্ডস' ওয়াইভস!' সংক্ষেপে: বারওয়েল বন্ধুপত্নীদের সম্পর্কে অতিশয় সফল।

বস্তুত বারওয়েলের 'নাবব' হিসেবে খ্যাতির পেছনে সেটাও একটা কারণ। বিলাসিতা ইত্যাদি অন্য আমোদে হিকি হয়ত তাঁর খুব পেছনে ছিলেন না, কিন্তু বারওয়েল তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সে তাঁর এই বিশেষ ক্রীড়াছন্দে। এখানে 'নাবব' বারওয়েল কখনও পশ্চিমের

'হোয়াইট', কখনও নীচতা এবং ক্রূরতায় তিনি প্রাচ্যের কোন হীন নবাব। যথা : শ্রীমতী সারা উপাখ্যান।

১৭৬৯ সনের কথা। কোম্পানির নৌবহরে তখন একজন নবীন সহকারী ক্যাপ্টেন ছিলেন। নাম তাঁর মিঃ হেনরী এফ টমসন। ভদ্রলোক ছুটিতে দেশে গিয়ে হঠাৎ একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেললেন। মেয়েটির নাম—সারা। সারা বোনার। কত লোকই তো ভালবাসে। কিন্তু টমসন উন্মাদ-প্রেমিক। তিনি কিছুতেই সারাকে দেশে ফেলে রেখে আর ইণ্ডিজে ফিরবেন না। অথচ ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। হাতে এমন সময় নেই যে দিনক্ষণ দেখে শুনে চার্চের কর্তব্যটা সেরে ফেলেন। উপায়ান্তরহীন টমসন অতএব অন্য পথ ধরলেন। কলকাতায় বন্ধুদের তিনি জরুরী চিঠি পাঠালেন—তোমরা শুনলে নিশ্চয় প্রীত হবে যে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছি, তিনি আমার পেছনে পরের জাহাজই আসছেন।

আগের জাহাজে টমসন কলকাতায় এসে নামলেন। সে কী খাতির তাঁর! জাহাজ-ঘাটায় সকলের আগে এগিয়ে এসে তাঁকে যিনি অভিনন্দন জানালেন তিনি স্বয়ং বারওয়েল। বারওয়েল সেখানেই থামলেন না। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে টমসনের পদোন্নতি ঘটালেন। এবং পরের জাহাজে সারা এসে পৌঁছনোমাত্র ওঁদের বসবাসের জন্যে নিজের একখানা বাড়ি ছেড়ে দিলেন। বিখ্যাত মাদাম গ্রাণ্ডের বিয়ের সময়েও তিনি তাই করেছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'নাববে'র সেটাই স্বভাব। এমনভাবে উঠে পড়ে লাগবেন তিনি, কারও 'না' বলবার জো নেই। টমসনও পারলেন না। বিশেষ, বারওয়েল শুধু 'নাবব' নন, লাটবাহাদুরের দরবারেও তিনি একজন!

নতুন বাড়িতে টমসন আর সারা সংসার পাতলেন। বারওয়েল বন্ধু এবং বাড়িওয়ালা। মাঝেমধ্যে তিনি বন্ধুর ঘরে পদধূলি দেন। কে কেমন আছেন, খোঁজ খবর করেন। তাঁর আন্তরিকতায় টমসন মুগ্ধ।

দিন যায়। হঠাৎ শোনা গেল, বারওয়েল তাঁর জন্যে সেখানে একটি মস্ত চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন। পদটি ডেপুটি পে-মাস্টারের, মাইনে বছরে

সাত হাজার টাকা। টমসন অর্থচিন্তায় দূর বিদেশে এসেছেন—তিনি আপত্তি করতে পারলেন না। বারওয়েল আশ্বাস দিলেন—তুমি মিছেমিছি ভেবো না ভাই, আমি তো রয়েছি—তোমার সংসারের দায়িত্ব আমার উপর রইল।

এদিকে সহসা এক অপ্রত্যাশিত ওলটপালট ব্যাপার ঘটে গেল। স্বয়ং বারওয়েলই বদলী হয়ে গেলেন বহরমপুরে। বহরমপুর থেকে মাইল কয়েক দূরে মতিঝিলে। তিনি অনুরোধ জানালেন, টমসনকেও আমার কাছে বদলী করা হোক। কিন্তু যে কোন কারণে কর্তৃপক্ষ অসম্মত হলেন। সম্ভবত কলকাতার বিধাতারা তখন বারওয়েলের ওপর বাম। তাঁরা টমসনকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

টমসন আবার সারার কাছে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর মনে হয় সারা যেন আর আগেকার মত নেই। তাঁর কেমন উড়োউড়ো ভাব। টমসন ভেবে পান না, হঠাৎ কী হল মেয়েটার। মাত্র কিছুকালের মধ্যেই এমন হয়ে যাবে কেন সারা?

ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে দেরী হল না। একদিন ডাক পিওন এসে সেলাম করে টমসনের হাতে চিঠি দিয়ে গেল একখানা। ওপরে ঠিকানা লেখা মিঃ কার্টারের। কার্টার প্রতিবেশী, ওঁদের পাশের বাড়িতে থাকেন। সে বাড়িটিও বারওয়েলের। কি মনে করে হঠাৎ নিজের অজান্তে চিঠিটা খুলে ফেললেন টমসন। সঙ্গে সঙ্গে সারার আচরণ তাঁর কাছে শরতের ভোরের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। বারওয়েল লিখছেন: স্যাণ্ডারসন চায় না তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখ। কেননা সে তার বয়স এবং অন্যান্য সদ্‌গুণগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার চায়।...সে যা হোক, আমি কি বলছি জান? আমি বলছি সারা, তুমি আমার ভালবাসা এবং তোমার দৈহিক সৌন্দর্য দুয়ের ওপরই ঘোরতর অবিচার করছ। আর্শিতে একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ তুমি, দেখবে তোমার মধ্যে সেই রূপ বর্তমান যা বার্ধক্যকেও উষ্ণ করে তুলতে সক্ষম; ক্যান এ ইয়ংম্যান বি ইনডিফারেন্ট টু দেম? চিঠির শেষ কথা—সারা, আমি তোমাকে ভালবাসি,

আই উইশ, ইউ ওয়্যার উইথ মি অ্যাণ্ড ইওর হাসব্যাণ্ড অ্যাট এ ডিস্‌ট্যান্স।

চিঠির পর চিঠি। বোঝা গেল তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্ধুকৃত্য করে ফেলেছেন বারওয়েল। টমসন সারাকে ডাকলেন। তারপর বললেন—আর নয়, তোমাকে এবার দেশে যেতে হবে সারা। অনেক হয়েছে, আর লোক হাসানো ঠিক নয়।

সারা দেশে যাবেন। সব ঠিক। এমন সময় মফঃস্বল থেকে বারওয়েল এসে হাজির। তাঁর আরও পদোন্নতি হয়ে গেছে। এখন থেকে তিনি কলকাতাতেই থাকবেন। সুতরাং সারা দেশে যাবেন কোন দুঃখে? তিনি বেঁকে বসলেন। টমসনকে তিনি স্পষ্টতই বলে দিলেন—তুমি এবার বিদেয় হলেই ভাল। আমি চাই না, তুমি আর এখানে থাক। ভেবে দেখ, যদি চলে যেতে সম্মত হও তবে কিছু টাকা পাবে, অসম্মত হলে কিছুই পাবে না; মনে রাখবে শাস্ত্রীয় ভাবে আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।

টমসনের বুঝতে বাকী রইল না, প্রস্তাবটা আসলে বারওয়েলের। তিনি অমত করতে ভরসা পেলেন না। বে-সরকারীভাবে একটা দলিল তৈরী হল। সাক্ষী থাকলেন স্বয়ং হেস্টিংস আর রবার্ট স্যাণ্ডারসন। স্থির হল, সারার দুটি সন্তানের খোরপোষ বাবদ বারওয়েল পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেবেন, আর ডিভোর্স তথা 'বিচ্ছেদের' খরচা বাবদে দেবেন—তিনশ' পাউণ্ড। সে দলিল হাতে নিয়ে জলের সাহেব আবার জলে ফিরে গেলেন। তিনি আবার নৌবাহিনীর জাহাজে চাপলেন। বিবাগীকে নিয়ে জাহাজ চলেছে এবার আরও পূবে, চীনদেশের দিকে। সে জাহাজ কোন বন্দরে পৌঁছতে না পৌঁছতে মাঝপথে হঠাৎ আবার বারওয়েলের জরুরী চিঠি: সত্বর কলকাতায় চলে এস। মনে রাখবে, তোমার নিজের স্বার্থেই তোমার আসা দরকার।

বেচারা টমসন হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। এসে শুনলেন—সারাকে স্বদেশগামী একটা জাহাজে তুলে দিয়েছেন বারওয়েল। তাঁর ইচ্ছে

টমসনও এবার ফিরে যান। কিন্তু দলিলের সেই টাকা? বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বারওয়েল বললেন—লণ্ডনে আমার ভাই আছেন। তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তাঁকে সেটা দেখাবে। টাকাটা তিনি তক্ষুণি তোমাকে দিয়ে দেবেন।

টমসনের জাহাজ ছাড়েছাড়ে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বারওয়েল এসে হাজির।—এই কাগজটায় একটা সই করে দাও তো ভাই, নয়ত লণ্ডনে হয়ত ওরা টাকাটা তোমাকে দিতে চাইবে না। টমসনের মন তখন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তিনি তাঁর ভাগ্যের কথা ভাবছেন। চাকরি গেল, সারা গেল,—নিজের দুটি সন্তান, হিন্দুস্থানে নিশ্চিত জীবনের প্রতিশ্রুতি—সব গেল।—কী হবে আর সামান্য কিছু টাকার জন্যে ভেবে? তিনি চোখে বুজে বারওয়েলের হাতের কাগজটায় সই করে দিলেন।

লণ্ডনে নেমে টমসন জানলেন—যে কাগজটায় তিনি সই করে এসেছেন সেটা আর একটা দলিল। আগের দলিলটাকে নাকচ করাতেই তার হরফগুলোর তাৎপর্য! টমসন নির্বাক। বারওয়েল সম্পর্কে এবার আর তাঁর সিদ্ধান্তে দ্বিধা নেই। লোকটা সত্যিই 'নাবব'। টমসন স্থির করলেন কুচক্রী এই 'নাববের' কীর্তিকাহিনী তিনি উদ্‌ঘাটন করবেন। তাঁর জীবনের সুখ, শান্তি, সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার বদলি হিসেবে 'নাবব' বারওয়েলকে তিনি অন্তত একবার তাঁর স্বরূপে উপস্থিত করবেন। টমসন কলম নিয়ে বসলেন। ফল: তৎকালের বিখ্যাত বিলিতি কেচ্ছা—'দি ইনট্রিগস অব এ নাবব' অথবা 'বেঙ্গল, দি ফিটেস্ট সয়েল ফর লাস্ট।' বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সনে। টমসন লিখিত এই সারা-কাহিনী নিয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে এবং কোম্পানি-পাড়ায় সেদিন রীতিমত চাঞ্চল্য।

কিন্তু সে তরঙ্গ কলকাতা স্পর্শ করতে পারল না। বারওয়েল তেমনি যথাপূর্ব 'নাবব' রয়ে গেলেন। বরং লক্ষণ দেখে মনে হয় প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তাঁর ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। সারা কলকাতায় থাকতে থাকতেই তিনি কাউন্সিলের প্রাচীনতম সদস্য ক্লেভারিংয়ের মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। ক্লেভারিং তার উত্তর হিসেবে পাণিপ্রার্থী 'নাববের' হাতে

একটা পিস্তল তুলে দিয়েছিলেন। বারওয়েলকে তিনি দ্বন্দ্ব আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে ১৭৭৫ সনের এপ্রিল মাসের কথা। বজবজের পথে ওঁরা দু'জনে ডুয়েল লড়েছিলেন। সে বছরই সেপ্টেম্বরে সারা বিদায় হল। বিরক্ত, ক্লান্ত 'নাবব' পুষ্পের সন্ধানে নবীন উত্তম নিয়ে আবার আসরে নামলেন। এবার লক্ষ্য তাঁর সেকালের কলকাতার অন্যতম নায়িকা স্যাণ্ডারসন দুহিতা মিস স্যাণ্ডারসন। খ্যাতিতে তিনি তখন প্রায় রূপকথার নায়িকা। একবার কথাচ্ছলে মৃদু হেসে সখীদের তিনি বলেছিলেন —এবার আমার ডিজাইন মত পোশাক পরে যে গভর্নমেণ্ট হৌসের নাচের আসরে আসবে আমি তাঁর সঙ্গেই নাচব। নাচের দিন দেখা গেল—কমসে কম ষোলজন তরুণ এক পোশাকে হাজির হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অঙ্গেই মিস স্যাণ্ডারসনের সেই পছন্দের পোশাক। নায়িকার মতই আচরণ করেছিলেন সেদিন মিস স্যাণ্ডারসন। পর্যায়ক্রমে তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে নেচেছিলেন। নাচের শেষে ওঁরা সার বেঁধে তাঁর পাল্কী ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন সেদিন। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত্ত এ হেন স্যাণ্ডারসনও শেষ পর্যন্ত কিন্তু মালা দিয়েছিলেন বারওয়েলের গলায়! কেননা, বারওয়েল কখনও কখনও হীন এবং কুটিল চরিত্রের মানুষ হলেও তিনি 'নাবব'।

মিস স্যাণ্ডারসন যে হিসেবে ভুল করেননি, তার প্রমাণও বারওয়েল রেখে গেছেন। সাউথ পার্ক স্ট্রীটের পুরনো কবরখানায় পা দিলে আজও যে পিরামিডটি বিশালতা এবং গাম্ভীর্যে সকলের আগে কাছে টানে সেটি 'নাবব' বারওয়েলেরই কীর্তি। বিয়ের পর মাত্র দু'বছর বেঁচে ছিলেন এলিজাবেথ জেন। গর্বিত ফারাওয়ের ভঙ্গিতে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাইলেন—'নাবব' বারওয়েল। তিনি পিরামিডের হুকুম দিলেন। সে স্মৃতিসৌধ আজও বর্তমান। সে যেন এখনও দর্শকদের বলে, বারওয়েল 'নাবব' ছিলেন,—'নাবব'!

'নাবব'!

শুধু বব পট আর উইলিয়াম হিকি নন, শুধু বারওয়েল আর ক্লাইভ-

ওয়েলেসলি নন,—কলকাতায় তখন রাশি রাশি 'নাবব'। বিলাতি[illegible] তাঁরা কেউ সিরাজউদ্দৌলা-আসফউদ্দৌলা, ক্রুরতায় মীরজাফর-মীর[illegible] কিন্তু আশ্চর্য এই, তবুও ওঁরা কেউ আমাদের ইতিহাসে 'নবাব' নন। তার প্রথম কারণ অবশ্য—ওঁরা বিদেশের মানুষ, নবাবীর লোভে আগন্তুক। সে 'নবাবী', করায়ত্ত হওয়ার পরেও এদেশের চোখে ওঁরা নবাব হতে পারলেন না, কারণ আরও কিছু কিছু বস্তুর মত নবাবী ব্যাপারটা আমাদের একান্ত আপন, ঘরের রহস্য। কারও মন সহসা যদি তা হাত ছাড়া করতে রাজী না হয় তবে বোধহয় তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। ওঁরা তাই আমাদের কাছে 'লাটবাহাদুর', 'বড়াসাহেব', 'হুজুর' ইত্যাদি হয়েই রয়ে গেলেন—এত করেও হিন্দুস্থানী ইতিকথায় নবাব বলে কোন পরিচয় আদায় করতে পারলেন না। সে খেদ তাঁদের পূরণ করে দিল —শ্বেতাঙ্গ নবাবের স্বদেশ, অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ড। আপন সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা চমকে উঠলেন। যারা আমাদের ঘর ছেড়ে বিদেশযাত্রা করেছিল—ওরা নিশ্চয় আমাদের সেই বালকদল নয়, নিশ্চয় ওরা আর কেউ—'নাবব।'

'নাবব' মানে? অক্সফোর্ড ডিক্সনারী লিখছে: আদিতে এই শব্দটি 'নবাব'-এর বিকৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হত। নবাব মানে—এক শ্রেণীর মুসলমান রাজকর্মচারী যাঁরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে অথবা জেলাগুলোতে সহকারী গভর্নর হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে এখন 'নাবব' মানে—খুব ধনশালী ব্যক্তি; বিশেষত যিনি ভারতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে দেশে ফিরে এসেছেন; (অথবা) বিত্তশালী এবং বিলাসী ব্যক্তি। 'হবসন-জবসন' বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অভিধান অনুযায়ী —শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে; তখনই ক্লাইভের কার্যকলাপের কাহিনীর সঙ্গে শব্দটি ইংল্যাণ্ডে চালু হয়। যে সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ক্রমে তাঁদের সম্পর্কেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু হয়।—ইত্যাদি

সেদিক থেকে 'নাবব' সম্পূর্ণই বিলিতি ব্যাপার। তার সঙ্গে আমাদের

যোগ যা তা অনেকটা গুরু-শিষ্যের মত। কলকাতা তথা ভারতে এসেছিলেন বলেই ওঁরা যেমন ছুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি এদেশে দিল্লি-লখনউ, মুর্শিদাবাদ-চিৎপুর ছিল বলেই নবাবীয়ানাটা রপ্ত করতে পেরেছিলেন। এই স্থানগত এবং শিক্ষাগত যোগাযোগটা বাদ দিলে 'নাবব' সম্পূর্ণত শ্বেতদ্বীপের ঘরোয়া ব্যাপার। অনেকটা আমাদের বিলেত-ফেরতের মত। আমরা যেমন চোগাচাপকানে ওঁদের দেখে হঠাৎ সেদিন আঁতকে উঠেছিলাম—অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডও তাই করেছিল মাত্র। হোরেস ওয়ালপোল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন (১৭৬০) 'মোগল পিট এণ্ড নাবব বুট্‌স্' স্যমুয়েল ফুট কলম নিয়ে ব্যঙ্গ নাটিকা লিখলেন (১৭৬৮)—'দি নাবব'।

লেখালেখি পলাশীর পর থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু 'নাবব' বলতে সত্যিই কি বলা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারপরও পাঠকদের অবহিত করতে হত। একজন লেখক (জোসেফ প্রাইস) লিখেছেন : কেন কিছু কিছু লোককে 'নাবব' বলা হচ্ছে তার কারণটা স্পষ্ট করা দরকার। কেননা, আর্ল অব চ্যাথামের ঠাকুর্দা যখন মাদ্রাজে গভর্নর ছিলেন তখন কোন ইংরেজ কখনও এই শব্দটি শোনেনি, ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

অর্থাৎ, বলা নিষ্প্রয়োজন, ফিরিঙ্গী বণিক তখনই 'নাবব' হয়েছেন যখন পকেটে তাঁর নবাবীয়ানার নজরানা জোগাবার ক্ষমতা এসেছে। অনিবার্যভাবেই সেটা পলাশীর পরের ঘটনা। কেননা, বহু সই সুপারিশের পরে লেখা এবং অঙ্ক জানা সতের বছরের ইংরেজ বালক তখন যে রাইটার পরিচয়ে তাঁর জীবন শুরু করেন, তার বার্ষিক মাহিনা পাঁচ পাউণ্ড মাত্র। সিঁড়ির শেষ ধাপে সিনিয়ার মার্চেন্টের দুর্লভ পদ। তার মাইনে বার্ষিক—চল্লিশ পাউণ্ড! তাতে নবাবীয়ানা পরের কথা, সেদিনের কলকাতায় মেসের খরচও মেটে না। সুতরাং, 'নাবব' হওয়ার আগে বেশ কিছু দিন ওঁদের কাটাতে হল নবাবীর মহড়া দিয়ে। তারপর পলাশী—আলিবাবার চোখের সামনে নিমেষে রত্নগুহার দরজা খুলে গেল।

পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলা গিয়ে মীরজাফর এলেন। পারিতোষিক

হিসেবে কোম্পানির বড় এবং মেজো-সেজো কর্তাদের প্রত্যেকের হাতেও বেশ কিছু এল। তারপর মীরজাফরের বদলে মীরকাশেম এবং অবশেষে মীরকাশেমের বদলে নিজামউদ্দৌলা—প্রতি ক্ষেত্রেই নতুন করে প্রাপ্তিযোগ ঘটল। তার সঙ্গে যুক্ত হল—কনট্রাক্ট, সুদের কারবার, ঘুষ এবং রকমারী রোজগারপন্থা। ডিগবী লিখেছেন : পলাশী থেকে ওয়াটারলু—এই সময়ের মধ্যে ভারত থেকে কমপক্ষে দশ কোটি পাউণ্ড নগদ আমদানী হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। পিট পার্লামেণ্টে বলেছিলেন—পাঁচ বছর সাধুভাবে হিন্দুস্থানে কাজ করলে, কোম্পানির কর্মচারীরা বছরে বড়জোর দু'হাজার পাউণ্ড বাঁচাতে পারেন! ফিলিপ ফ্রান্সিস তাঁর বোনকে লিখেছিলেন—অপেক্ষা কর, বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাবে। আমি ভারত থেকে ফিরছি কিন্তু ধনী হয়ে ফিরছি না! কারও কারও ক্ষেত্রে এগুলো অবশ্য সত্য। এমন অনেক ভারত-ফেরতও দেখা গেছে, পকেটে যাঁদের এক ফার্দিংও নেই। কিন্তু তাঁরা নেহাৎই স্বাভাবিক মানুষ মাত্র। 'নাবব' তাতে রাজী হবেন কেন? ১৭৬৯ সনে বাংলা দেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হল। প্রত্যেক জেলায় একজন করে সুপারভাইজার নিযুক্ত হলেন। এই পদটিই ক'বছর পরে (১৭৭২) কালেক্টারে রূপান্তরিত হয়। ওঁরা প্রত্যেকে বে-আইনী ভাবে রোজগার করতেন। কেউ জমি রাখতেন, কেউ অন্য কোন ব্যবসা করতেন। জন বাথো নামে বর্ধমানে এক কালেক্টার ছিলেন। তিনি সেখানকার জনৈক জমিদার মহোদয়কে নুনের ব্যবসা পাইয়ে দিলেন। শর্ত : প্রথম দু' বছর তাঁকে বার্ষিক আটাশ হাজার পাউণ্ড নজরানা দিতে হবে। দ্বিতীয় বছরের টাকার কিছু ভাগ পাটনার কাউন্সিল সদস্যরাও ভোগে পেয়েছিলেন!

কেউ কেউ অন্য পথ ধরলেন। মাদ্রাজের গভর্নর (১৭৬৩—৬৭) রবার্ট পাক সুদের কারবার করতেন। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের ঠাকুর্দা উইলিয়াম থ্যাকারে শ্রীহট্টের কালেক্টার (১৭৭২) ছিলেন। তিনি বড় মানুষ হন কোম্পানিকে হাতি সরবরাহ করে! ভারতে তখন এমনি শত শত 'হঠাৎ নবাব'। যতদিন তাঁরা এদেশে ছিলেন ততদিন তাঁদের পূর্ণ পরিচয়

স্বদেশের মানুষের কাছে তত্তটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল স্বদেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র!

ফেরার পথে ক্লাইভের পকেটের অবস্থা কী ছিল আজ তা প্রবাদ। ভ্যানসিটার্ট ফিরেছিলেন পনের লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে, বারওয়েল—চার লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে হৈচৈ পড়ে গেল। কেন না, ওঁরা যে টাকা নিয়ে ফিরেছেন শুধু তাই নয়, ওরা 'নাবব' হয়ে ফিরেছেন। এতকাল বিলিতি সমাজ বিন্যাসে একটা মোটামুটি বাঁধাধরা ছক ছিল। ব্যবসা করতে যাঁরা দেশের বাইরে যেতেন, ফিরে এসে তাঁরা ব্যবসাতেই টাকা খাটাতেন। কিন্তু এবার যাঁরা ফিরছেন তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষের দল। তাঁরা না ব্যবসায়ী, না অভিজাত—'মাশরুম জেন্টলম্যান' বা ব্যাঙের ছাতা মাত্র। ইংল্যাণ্ড হাসিমুখে তাঁদের বরণ করে নিতে প্রস্তুত নয়। কেননা, প্রচলিত সমাজে আপন নির্দিষ্ট আসনের বাইরে পা বাড়ানো তার কাছে সঙ্গত আচার নয়। অর্থও সেদিনের ইংল্যাণ্ডের কাছে ততখানি দৃষ্টিকটু নয়, যতখানি বংশগত আভিজাত্যকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক। রাজা তৃতীয় জর্জ তাই একজন ছাড়া আর কাউকে লর্ড বানাতে রাজী হননি। 'আনজেন্টলি রীচ' বা 'ধনদৌলতে অত্যধিক' হঠাৎ 'নাববরা' তাঁর চোখে মোটেই সম্মানের পাত্র নয়! সুতরাং, কলকাতায় যে 'নাবব' ছিলেন মহামহিম রাজচক্রবর্তী বিশেষ, স্বদেশে পা দেওয়া মাত্র তাঁদের পরিচয় হয়ে দাঁড়াল—'দি প্লাণ্ডারারস অব দি ইস্ট!'—'রবারস অ্যাণ্ড মার্ডারারস!' '—বাণ্ডিটস!' ইত্যাদি। এমন কি খোদ কোম্পানিরও নতুন করে নামকরণ হল। কখনও সে—'ছাট হরিবল্ সোসাইটি'! কখনও বা—'এ ব্রাদারহুড অব ঠগস! হিকি লিখেছেন, দ্বিতীয়বার তাঁর ভারত যাত্রার সময়ে জাহাজঘাটায় তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসে এক বন্ধু তাঁর হাতে একটি তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'বুঝতে পারলে না, কেন দিচ্ছি? গিয়েই গোটা ছয় মানুষের গলা কেটে ফেলবে, তারপর পরের জাহাজেই 'নাবব' হয়ে ফিরে এস!'

ক্রমে সমালোচনা আরও তীব্র হয়ে উঠল। 'নাবব'কে উপলক্ষ্য করে

কাগজে কাগজে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা এবং চিঠি বের হতে লাগল। ফুট নাটকে তাঁদের বড়-মানুষির মুখে বিদ্রূপের চাবুক হেনেছিলেন, কবিরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। 'দি নাবব অব এশিয়াটিক প্লাণ্ডারারস' নামে বিয়াল্লিশ পাতা জুড়ে এক কাব্য কাহিনী প্রকাশিত হল। তার একটি ছত্র—'দেয়ার ব্রেস্টস আর স্টোন, দেয়ার মাইণ্ডস এজ হার্ড এজ স্টীল!' আর এক কবি লিখলেন (পাবলিক অ্যাডভারটাইজার. মে. ১৭৭৩):

> 'When the rich realms, where Alexander toiled,
> Shall by a pettifogger's son be spoiled;
> While London city oppress the Eastern globe,
> And pedlars fill the thrones of Aurang-zebe!'

ইত্যাদি।

'পেটিফগারস সান,' বলাবাহুল্য, ক্লাইভের প্রতি তির্যক দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র। সমাজে তখন এই 'হঠাৎ-নাববের' দল দেশের পক্ষে এক অপমান-জনক অস্তিত্ব। সবাই তাঁরা—হয় 'দরোয়ান-তনয়,' অথবা 'দাসী-পুত্র'। শুধু তাই নয়—হৃদয়হীন এই পাষণ্ডের দল প্রত্যেকেই হাজার হাজার নেটিভের হত্যাকারী। হিন্দুস্থানে তাঁদের কেউ একশ নিরীহ মানুষ খুন করে এসেছেন, কেউবা পঞ্চাশ হাজার। এঁদের দিকে মুখ তুলে তাকানো পাপ। ১৭৮৫ সনে হে মার্কেট থিয়েটারে 'দি মোগল টেল' নামে একটি হাসির নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। তার প্রতিপাদ্য বিষয়, জনৈক অভিযাত্রী ইংরেজের ভারতদর্শন। বেলুনে করে ভাসতে ভাসতে লোকটি এসে প্রবল প্রতাপ মোগল বাদশার সামনে হাজির হল। বাদশাহ বললেন, —'দরিদ্র জেণ্টুদের ওপর তোমার দেশবাসীরা এমন হৃদয়হীন ব্যবহার করেছে যে তার কাছে আমার অত্যাচার কিছুই নয়। বুঝলে হে ইংলিশম্যান, আমি তাই ঠিক করেছি এখন থেকে আমি কোমল, ন্যায়নিষ্ঠ এবং হৃদয়বান বাদশা হব!' বাদশার সে কথা শুনে, দর্শকের সে কি হাসি!

ইংল্যাণ্ড 'নাবব'কে নিয়ে এমন হাসিতে মত্ত হয়েছিল নানা কারণে। তার মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্যই ঈর্ষা। দেশে তখন চেস্টারফিল্ডের যুগ।

'স্যার,' 'ম্যাডাম' ইত্যাদি ভদ্রজনের মুখে একমাত্র শোভনীয় সম্ভাষণ। সার্কাস ছাড়া সে যুগ অন্য কোন আমোদ জানে না, ক্যান্ট্রি-জেণ্টলম্যান অথবা ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ভাবতে পারে না। তাও এই দুই শ্রেণী মর্যাদায় সমান নয়। জোতদার, ভূস্বামীর চোখে দ্বিতীয় শ্রেণী অনিবার্যভাবেই নিকৃষ্ট। 'নাবব' যাতায়াতি সেই শ্রেণী বিন্যাসে তছনছ ঘটিয়ে বসলেন। তাঁরা তা না করলেও অবশ্য পুরনো প্রাসাদ একদিন ভেঙে পড়ত। কেননা, দিকে দিকে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে,—রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ানের অজ্ঞাত কুলশীলরা সমাজে পরিচয় চাইছে। তবুও বিশেষ করে ভারত-ফেরত 'নাববের' দলই সেদিন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিলেন—কারণ তাঁরা প্রকাশ্যেই পুরনো ধারার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র এক জীবনরীতির সূচনা করতে মনস্থ করেছেন। সে রীতির প্রথম এবং শেষকথা—নবাবীয়ানা।

যেমন কলকাতায় কিংবা মুর্শিদাবাদে, ঠিক তেমনি স্বদেশে। 'নাবব' দেশে ফিরেও নবাবের মত থাকেন। নবাবীয়ানা ছাড়া জীবনে তাঁর যেন আর কোন ক্রিয়া নেই, কর্তব্য নেই। তিনি ব্যবসায়ে টাকা খাটাবার কথা ভাবতে পারেন না, অন্য কোন জীবিকাও তাঁর কাছে অসহ্য। দেশের মাটিতে নেমেই তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ গ্রামাঞ্চলে লোক দেখানো একটি প্রাসাদের বন্দোবস্ত করা। তারপর যদি সম্ভব হয় একবার পার্লামেণ্টে গিয়ে বসা। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৪ সনের মধ্যে অন্ততপক্ষে তিরিশ জন 'নাবব' পার্লামেণ্টে সম্মানের আসনগুলো অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁরা এই দুরূহ কাজ সম্ভব করেছেন জনপ্রিয়তায় নয়, অর্থবলে। এবং কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, স্রেফ নাববীয়ানা দেখবার জন্যে। তবে বাড়িই ছিল তাঁদের প্রথম নেশা।

'নাবব' বারওয়েল দেশে ফেরেন ১৭৮০ সনে। কয়েক হাজার পাউণ্ড দিয়ে তিনি লর্ড হ্যালিফাক্সের বাড়ি এবং আশপাশের জমিটুকু কিনে সেখানেই আস্তানা গাড়লেন। এই এস্টেটের বার্ষিক আয় দু'হাজার পাউণ্ড। তাতে হয়ত দিব্যি দিন চলে যেত, কিন্তু নাববের তখনও তেমনি কড়া মেজাজ।

মালিক হয়েই তিনি আশপাশের গ্রামবাসীদের তাঁর জমির কোন সুবিধা ভোগ করতে দিতে রাজী হলেন না। সেটা পুরনো মালিক কোনদিন ভাবতেও পারেননি। সুতরাং 'নাবব' অচিরেই প্রতিবেশীদের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখলেই পাড়ার লোকেরা টিটকারী দিত, উপহাস করত। উপায়ান্তরহীন বারওয়েল অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে অখ্যাতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। কলকাতার মত সাসেক্সেও তিনি 'নাবব' বলেই নাম করে ফেলেছেন। লণ্ডনে নিয়মিত ভাবে আঠারো চেয়ারে টেবিল সাজিয়েও বারওয়েল সে অপবাদ কোনদিন কাটাতে পারেননি। তাঁর শেষ দিনগুলো নির্বাসিত ভারতীয় নবাবদের মতই একান্তে মনমরা অবস্থায় অতি দুঃখে কেটেছে।

জমি, আর জমি। সব 'নাববের' জমি চাই। কলকাতার লটারী টিকিটে পর্যন্ত তখন (১৭৯১) প্রথম পুরস্কার মিডলসেক্সে মনের মত এস্টেট। দ্বিতীয় পুরস্কারও তাই, তবে এস্টেটটি এবার অপেক্ষাকৃত ছোট। সে লটারীর টিকিটের দাম ছিল প্রতিখানা দু'শ সিক্কা টাকা। তাহলেও সেবার টিকিট বিক্রি হয়েছিল তের হাজার পঁয়ত্রিশখানা। 'নাববের' নজরে তামাম দুনিয়ায় তখন এর চেয়ে আর বড় পুরস্কার নেই। বারওয়েল কিনলেন সাসেক্সের স্ট্যানস্টেডে, স্যার ফ্রান্সিস সাইকস বার্কশায়ারে, মেজর চার্লস মারসাক অক্সফোর্ডশায়ারে, এবং অন্যরা যে যেখানে পারেন সেখানে। মাদ্রাজের গভর্নর রবার্ট পাক ডেভনশায়ারের বিখ্যাত হলড্যান হাউস কিনলেন। কেনার পর নাববী কায়দায় আবার তিনি তা ভেঙে গড়লেন। এবার বাড়িটি দেখলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় কোন বাকিংহাম প্যালেস। রবার্ট তারই আদলে তাঁর বাসস্থানটি তৈরী করিয়েছেন। আর এক 'নাবব' উইলিয়াম হর্নবি তেতাল্লিশ বছর ভারতে ছিলেন। তার মধ্যে তেরো বছর কেটেছে তাঁর বোম্বাইয়ের গভর্নরের আসনে। ১৭৮৪ সনে দেশে ফিরে তিনি হ্যাম্পশায়ারের উপকূলে হুকহাউস নামে একটি বাড়ি তৈরী করলেন। সে বাড়ি হুবহু বোম্বাইয়ের গভর্নর হাউস! বোঝা যাচ্ছে, 'নাবব' তখনও তাঁর সাধের সোনার ভারতের কথা ভুলতে পারেননি।

শুধু বাড়ি তৈরী নয়, বাড়ির সাজসজ্জায়ও সেই ভারতে অতিবাহিত সুবর্ণ দিনের স্মৃতি মন্থন। স্যার রবার্ট বার্কার ভারতে সেনাপতি ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বিখ্যাত শিল্পী টিলি কিটলকে ডেকে বিরাট বিরাট দুটি ছবি আঁকালেন। তার একটিতে দেখা যাচ্ছে, বৃটিশ সেনাপতি স্যার রবার্ট ফয়জাবাদে রোহিলাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করছেন। অন্যটির বিষয়বস্তু অযোধ্যার নবাব কর্তৃক বৃটিশ বাহিনীর অভ্যর্থনা। ভূতপূর্ব সেনাপতির বিরাট প্রাসাদে পা দিলেই সকলের আগে চোখে পড়ত এই দুটি চিত্র! আর এক 'নাবব' উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ১৭৬০ সন বা তার কাছাকাছি সময়ে বাংলা থেকে তুর্কীর দেশে বাগদাদ-জেরুসালেম হয়ে স্থলপথে দেশে পৌঁছেছিলেন। তিনি বাড়ির দেওয়ালে তাঁর জীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনাটির চিত্ররূপ ঝুলিয়েছিলেন!

শুধু এই পরোক্ষ স্মৃতিচারণ নয়, দেশে ফেরার পরও 'নাবব' যে হিন্দুস্থানের মায়া কাটাতে পারছেন না, প্রতিবেশীরা ক্রমে তার পরিচয়ও পেলেন। কেউ কেউ সঙ্গে করে এদেশের ভৃত্য খানসামাদের বয়ে নিয়ে যেতেন। হিকি মুন্না নামে একটি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি ওর নাম দিয়েছিলেন উইলিয়াম মিন্নাউ। কেউ কেউ সঙ্গে করে তাঁর ঘোড়া-কোচম্যান সমেত তাঁর অতি প্রিয় ছ'ঘোড়ার গাড়িটি পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। চৌরঙ্গীর কায়দায় আগে পিছে হরকরা, চোপদার সাজিয়ে 'নাবব' যখন সে গাড়িতে সান্ধ্যভ্রমণে বের হলেন—ইংল্যাণ্ড, অষ্টাদশ শতকের মৃতপ্রায় প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। বাড়ি, এমন কি টাকা-পয়সার বাড়াবাড়িও তবু সহ্য হয়, কিন্তু এ নবাবী! ওঁরা প্রকাশ্যে নাববের নৈতিকতায় প্রশ্ন তুললেন। সকলে সমবাক্যে বললেন—ওরা ইংরেজের কেউ নয়, সমাজের তলানি মাত্র। বিখ্যাত নাবব স্যার টমাস রামবোল্ড সম্পর্কে বেনামে লেখা পদ্য প্রচারিত হল:

"When Macreth served in 'Athens' crew
He said to Rambold,' 'Black my shoe';

He humbly answered 'yea Bob'
But when returned from Indian's land
And grown too proud to brook command,
His stern reply was 'No-bob, !"

'নাবব' রামবোল্ড তখন পার্লামেণ্টের সভ্য হয়েছেন। কাগজে কাগজে প্রতিদিন 'নাববে'র কুৎসা প্রচারিত হতে লাগল। কেউ লিখলেন: লজ্জার কথা, সেদিন জনৈক 'নাবব' এক ভদ্রসম্মেলনে হাজির হয়ে, যে অসৌজন্য দেখিয়েছেন তা লিখতেও লজ্জায় আমাদের মাথা নুইয়ে আসে। 'নাববে'র এমন দুঃসাহস তিনি তাঁর সঙ্গে করে সেখানে একজন মিস অমুককে নিয়ে গিয়েছিলেন, যিনি আসলে একজন রূপোপজীবিনী! অন্য একজন লিখলেন: সাবধান, কোন ভদ্রমহিলা যেন ভুলেও কখনও কোন 'নাববে'র সঙ্গে না নাচেন। 'নাবব' তখন দাস-ব্যবসায়ী, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খামার মালিকের চেয়েও ঘৃণ্য এক অসামাজিক জীব। তারা ভাল বাড়ি কেনে, ভাল খায়, যত খায় তার চেয়ে বেশী অপচয় করে, ছড়ায়। তারা ডুয়েল লড়ে, জুয়া খেলে, মাত্রাহীন বিলাসে গা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করে। একজন স্পষ্টতই 'বরের কাগজে খেদ করে চিঠি লিখলেন: দিনকাল যা পড়েছে দেখতে পাচ্ছি প্যাট্রিয়ট, নাবব আর সুগার প্ল্যাণ্টারদের যেন কাল পড়েছে। কাণ্ট্রি-জেণ্টলম্যান নামে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত নামটি হয়ত এর পর ওয়েস্টমিনিস্টারে কোন গীর্জায়ই হারিয়ে যাবে! আরও নানা গুজব। খবর বের হল কলকাতা-ফেরত জনাকয় 'নাবব' সুদূর বাংলাদেশে জনৈকা অসহায় বৃদ্ধার জন্য কুড়ি পাউণ্ড সাহায্য দিচ্ছেন। ভদ্রমহিলাকে ওঁরা প্রবাস জীবনে চিনতেন। তাই শুনে চারদিকে সে কী গুজব! একদল রটিয়ে দিল—দিনকয় আগে লণ্ডনে একজন 'নাবব' নেমেছে। সে সঙ্গে করে চার লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে এসেছে। লণ্ডনে তার এক বোন ছিল। মেয়েটি দুঃস্থা। 'নাবব' তার খোঁজ করেছিল বটে, কিন্তু বোনকে কী দিয়েছে জান?—মাত্র এক মোহর। অর্থাৎ—এই আমাদের 'নাবব'। ওরা নিজের বোনের খোঁজ রাখে না, চাঁদা পাঠায়

কলকাতায়। —হুঁ। ঈর্ষাকাতর বাড়িওয়ালা হিন্দুস্থান-ফেরত ভাড়াটের মেয়ের গায়ে একটু ভাল পোশাক দেখামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন।

এই সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে, বলা-বাহুল্য, 'নাবব' ক্রমে এক অসহায় জীবে পরিণত হলেন। কলকাতার কাগজগুলো তাঁদের যোগ্য আসনের জন্যে দরবার করতে লাগলেন। এখানে চিঠি ছাপা হতে লাগল—আমরা খবর পাচ্ছি, ইস্ট ইণ্ডিয়ানরা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে আছেন। কেউ তাঁদের খাতির করেন না। কলকাতা প্রবাসী কবি কেঁদে কেঁদে কবিতা লিখলেন—হাউ লং বৃটানিয়া!—বৃটেন, আর কতকাল তোমার কোলের সন্তানেরা ধূলায় গড়াগড়ি যাবে। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না। হিন্দুস্থানী টবের ফুল 'নাবব' ধীরে ধীরে তাঁর অবধারিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চললেন। ভারত-ফেরত মাত্রই অবশ্য ঝরে গেলেন না। কেননা, সকলে সমান 'নাবব' নন। বাংলার গভর্নর (১৭৭০—৭২) জন কর্টিয়ার আদর্শ 'নাবব' ছিলেন।' তিনি কেন্টের এক কোণে নিরিবিলি জীবন যাপন করতেন। তিনি শেষদিন পর্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ 'সায়েন্টিফিক নাবব' বা বৈজ্ঞানিক 'নাবব' ছিলেন। তাঁরা নিজের ঘরে বসে নিজের পয়সায় বিজ্ঞান চর্চা করতেন। জন ওয়েলস নামে একজন ছিলেন। তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে চিঠিতে বিজ্ঞানালোচনা করতেন। আর একজন, ভূতপূর্ব মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার কর্নেল জন কল—শেষ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সভ্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভারত-ফেরত মাত্র, সাচ্চা 'নাবব' নন। সাচ্চা 'নাবব' সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাঁরা লণ্ডনে জেরুসালেম কফি হৌস বসিয়েছেন, দু'বেলা 'কারি এণ্ড পিলাউ' মারেন, আগে পিছে নেটিভ ফুটম্যান সাজিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে বগি হাঁকান। তাঁরা মদিরা ছাড়া মদ চেনেন না, ডুয়েল ছাড়া তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা জানেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই 'কারি' এবং 'পিলাউ' 'নাববী' লণ্ডনে এক রীতিমত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। 'নাবব' লণ্ডনে বহু জিনিস আমদানি করেছিলেন। ভারতীয় কোচম্যান থেকে শুরু করে বাঘ, সিংহ, বেড়াল—

সব। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল নাকি এই 'কারি' আর 'পিলাউ'। 'নাববে'র টেবিলে তো বটেই, কারি নিয়ে তখন রেস্টুরেন্টগুলোতেও রীতিমত কাড়াকাড়ি। সবচেয়ে নাম ডাক তখন (১৭৭৩) হে মার্কেটের নোরিস স্ট্রীট কফি হাউসের কারির। সময়ে সেখানে পৌঁছনোর জন্যে লণ্ডনের ছোকরাদের মধ্যে সে কী হুড়োহুড়ি! দ্বিতীয় বিখ্যাত কারি ২৩নং পিকাডেলির সোর্লিস পারফিউমারী ওয়ারহাউসের। ১৭৮৪ সনে এক বিজ্ঞাপনে সে কারির গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে ওঁরা জানিয়েছিলেন— "It renders the stomach active in digestion —The Blood naturally free in circulation—The Mind vigorous,—and contributes most of any Food to an increase of Human Race!'

কারি ছাড়া নাববী-আমলের ইংল্যাণ্ডে আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ 'এশিয়াটিক টুথ পাউডার'। তার বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে: স্টিল কেপ্ট ইন ইণ্ডিয়া ফ্রম ইউরোপীয়ানস!'—ভারতের গোপন রহস্য।

পাতাবাহারে রঙের অভাব ছিল না। কিন্তু হায়, বেচারা 'নাবব' তবুও শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা করতে পারলেন না। হিন্দুস্থানের নবাবদের মতই ওঁরা ক্রমে বিবর্ণ হতে হতে অবশেষে ঝরে পড়লেন। নৈরাশ্যে কেউ আত্মহত্যা করলেন, কেউ পাগলা গারদে আস্তানা পেলেন, কেউ বা বেনফিল্ড অথবা রিচার্ড স্মিথ হলেন।

'নাবব' পল বেনফিল্ড ছিলেন একটু অন্যধরনের 'নাবব'। দেশে ফিরে তিনি ব্যাঙ্কার হয়েছিলেন। কিন্তু নাববের সেই স্বভাব যাবে কোথায়? ডারহামের জনৈকা মিস সুইনবার্নকে ঘরে আনতে গিয়ে পুরনো রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাহেবের মনে পড়ে গেল তিনি 'নাবব'। সুতরাং কনের আংটি বাবদেই তিন হাজার পাউণ্ড উড়ে গেল, আর তিন হাজার পাউণ্ড গেল অন্য কি আর একটা গয়নায়। 'নাবব' তাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখালেন না। তিনি স্ত্রীর হাত ধরে বললেন— ভাবছ এ-ই আমার সব? মোটেই তা নয়। চার্চে দাঁড়িয়ে বলছি, এর

শয় থেকে হাতখরচা ছাড়াও আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি বছর বছর পাঁচশ পাউণ্ড করে পাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, মিসেস বেনফিল্ড জীবনে তা কোনদিন পাননি। কেননা, পল বেনফিল্ড সম্পর্কে পরবর্তী খবর যা জানা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়—তিনি প্যারিসে চরম দুরবস্থার মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চাঁদা তুলে তাঁর শেষকৃত্যের যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়।

একই কাহিনী জেনারেল রিচার্ড স্মিথের। বিলিতী নাবব-নামায় তিনি 'নাবব অব নাববস'। তাঁকে নিয়েই স্যামুয়েল ফুটের বিখ্যাত নাটক 'দি, নাবব'। স্মিথ সেখানে অবশ্য স্মিথ হিসাবেই নেই—নাম তাঁর স্যার ম্যাথু মাইট। সংক্ষেপে তাঁর কাহিনীটি নিম্নরূপ।

রিচার্ড স্মিথ একজন নাবব। হিন্দুস্থানে তিনি বেঙ্গল আর্মির একজন জেনারেল ছিলেন। ১৭৬৯ সনে দেশে ফিরে স্মিথ বার্কশায়ারে একটি বাগান-বাড়ি কিনলেন। তৎসহ গুটিকয় রেসের ঘোড়া। বার্কশায়ারের চিলটার্ন লজ-এর মালিক নাবব স্মিথ বিখ্যাত জকি-ক্লাবেরও একজন সদস্য। ১৭৮০-৮১ সনে স্বদেশের রেসের মাঠে তিনি এক স্মরণীয় নাম। ঘোড়া ছাড়াও 'নাবব' স্মিথের অন্য ব্যাধি ছিল। তিনি অন্যতর জুয়াতেও আসক্ত ছিলেন। শোনা যায়, এক আসরেই নাবব চার্লস জেমস-এর কাছে আঠার লক্ষ পাউণ্ড হেরেছিলেন। কিন্তু 'নাবব' স্মিথ তাতেও দমেননি। একদিন সেন্ট জেমস স্ট্রীটের এক হোটেলে গিয়ে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য, ক্ষণিক বিশ্রাম করবেন। শোবার আগে বাটলারকে কাছে ডেকে নাববাবাহাদুর বললেন—দেখ, অন্তত হাজার তিনেক গিনি নিয়ে যদি কেউ খেলতে আসে তবেই আমাকে ডেক, নয়ত মিছেমিছি আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

জাত-নবাব। স্বভাবতই ক্রমে পার্লামেন্টের দিকেও স্মিথের নজর পড়ল। বিশেষ করে স্মিথ যখন বুঝতে পারলেন, সেখানকার ঐ সম্মানের আসনগুলোও কাঞ্চনমূল্যের অতীত নয়, তখন তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। রিচার্ড স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেদিকে হাত বাড়ালেন। তিনি হাউস

অব কমন্স-এ এলেন। শুধু তাই নয়, নিজে তো এলেনই, চার হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে প্রিয় সাগরেদ মেজর স্কটের জন্যেও আর একখানা আসন জোগাড় করলেন। কিন্তু ঘরে ইংরেজের সততা গঙ্গাতীরের 'সতী'দের মত। বিশেষত আসামী যেখানে 'নাবব'। ওঁরা দুর্নীতির দায়ে স্মিথকে আসনহীন করে ফেললেন। এমন কি ছয়শ' ছেষট্টি পাউণ্ড জরিমানা পর্যন্ত হয়ে গেল তাঁর! তদুপরি ছ' মাসের কারাবাস! 'নাববের' নিগ্রহ সেখানেই শেষ হল না। পার্লামেণ্টের 'দ্বাররক্ষীদের' পরেই পেছনে লাগল পাওনাদারেরা। 'নাবব' স্মিথ আজ এখানে, কাল সেখানে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে (১৭৯২) আরও অসংখ্য 'নাববের' মত তিনিও হারিয়ে গেলেন। সম্ভবত তিনিও আমাদের দেশের মাটিতে জাত; মুর্শিদাবাদ-লখনউর জল হাওয়ায় লালিত বিচিত্র সেই অর্কিডটির শেষ পাপড়ির নাম ছিল—লর্ড নয়, ব্যারন নয়, নাইট নয়,—নাবব!

তারপরেও অবশ্য শ্বেতদ্বীপে মাঝে মাঝে শোনা যেত কোন কোন 'নাবব'-এর কাহিনী। কিন্তু তারা কেউ চৌরঙ্গী বা চুঁচুড়া-ফেরত ইংরেজ-সন্তান নয়—চতুষ্পদ ঘোড়ামাত্র। রেসের বইয়ে 'নাবব' তখন বেপরোয়া ঘোড়াদের নাম!

॥ মেমসাহেব ॥

—আপনি কি বিবাহিত ?

—না।

—আপনার ধর্ম ?

—আপনি তো জানেন ফরাসীরা সাধারণত ক্যাথলিক। আমি প্রটেস্ট্যান্ট নই।

—তা হলে আপনি ক্যাথলিক ?

—নিশ্চয়ই। আমাদের পরিবারের সবাই ক্যাথলিক।

—কিন্তু আপনিও কি ক্যাথলিক ? একটু বিশদ করে বলুন। আমি ঠিক আপনাকে বুঝতে পারছি না !

—আমি তো আগেই বলেছি আমরা ক্যাথলিকদের পরিবার। আমার মনে হয় না ধর্মবিশ্বাসে আমি আমার বাপ-মা থেকে স্বতন্ত্র।

জনৈকা তরুণী মেম আর জনৈক ফরাসী যুবকের কথোপকথন। মাত্র ক'মিনিট আগে কোন ভোজসভায় ওঁদের পরিচয় হয়েছে। কথোপকথনের এটা দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায় শুরু করল মেয়েটি নিজেই।

—মহাশয়ের বিষয়-আশয় ?

—বিশেষ কিছুই না।

—তা হলেও, বছরে আপনার খরচ কত ?

—সত্যি বলব ?—সেটা আমি বলতে পারব না।

—আশ্চর্য !—আমার মনে হয় সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়াই ভাল। তাই নয় কি ?

—তাই যদি বলেন, তবে বছরে আমার আয় এই ধরুন পনের হাজার ফ্রাঁ।

—মাত্র ! সে তো মশাই এদেশে ক্যাপ্টেনদের মাইনে !

—আমার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়ে অতএব জিজ্ঞেস করা হল, মহাশয়ের বাবা বেঁচে আছেন কি না, মারা গেলে কি পরিমাণ সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি। তার পরই মেমেসাহেবের প্রশ্ন।

—আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন ?

—কারণ, ইচ্ছে এবং সুযোগ কোনটাই হয় নি।

—আপনার বয়স ?

—আটাশ।

—তাহলে বুঝতেই পারছেন, বিষয়টা নিয়ে ভাববার পক্ষে এটাই সময়।

—কি যে বলেন ? ফরাসীদের নিয়মে আমি তো এখনও নাবালক। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমরা ইংরাজদের চেয়ে অনেক বেশী বয়সে বিয়ে করি।

—সেটা মোটেই ভাল নয়।

—কেন, খারাপ কিসে ?

—হুঁ !…তবে না আপনারা খ্রীষ্টান !

—অবশ্যই। আমি তো আগেই বলেছি আমরা ক্যাথলিক।…

—বোঝা গেল, আমি দার্শনিকের পাল্লায় পড়েছি। একে দার্শনিক তায় আবার ফিলানথ্রপিক ! আচ্ছা মশাই, হলেনই বা ফিলানথ্রপিক, তাতে বিয়ে করতে দোষ কি ?

—আমি কি বলেছি বিয়ে করা দোষের ?

—আপনার সত্যিই দৃষ্টিশক্তি কম।

—দেখতেই পাচ্ছেন আমি চশমা পরি।

—তার সঙ্গে চশমার কোন যোগ নেই।

—তবে কিসের আছে ?

—বিয়ের।

অতঃপর আরও নানা কথা। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে সুখী কি না, ছেলেরা যদি ফিলানথপিষ্ট সেজে ঘুরে বেড়ায় মেয়েরা তাহলে নিজেদের

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হলে কিনা, হলে সেটা ধর্মবিরুদ্ধ হয় কিনা—ইত্যাদি নানা যুক্তির পরেও যখন দেখা গেল টেবিলের অধিকাংশ ডিশ এখনও ছোঁয়াই হয় নি, মেমসাহেব তখন অন্য কথা পাড়লেন। একই কথা, তবে অন্য ভাবে।

—আচ্ছা, দেখতে ভাল নয় এমন মেয়েকে কি আপনি কখনও ভালবাসতে পারবেন?

—সত্যি বললে, আমার মনে হয় তার চেয়ে বেশী গুরুতর—ব্যবহারে নম্রতা।

—তার মানে আপনি বলতে চান, যে মেয়ে দেখতে ভাল নয় এবং আচার-ব্যবহারও যার খুব নম্র নয় তাকে কুমারী থেকে যেতে হবে!

—মোটেই না, আমি কখনো তা বলি নি।

—বললেও তাতে কিছু আসে যায় না।—মেয়েরা সাধারণত সবাই ভদ্র এবং নম্র।

—আপনার উচিত ছিল আমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ দেওয়া!

তারপর এল গ্রীক ট্যাজেডি, ভলতেয়ার—ভলতেয়ারেব কোন্ লেখা সবচেয়ে ভাল, নিষিদ্ধ-বই পড়া উচিত কি না ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। ইংরাজ এবং ফরাসী জাতি-চরিত্রও বাদ গেল না। অবশেষে মেমসাহেব বললেন:

—আমি ভেবে দেখলাম, যাঁর যথেষ্ট পয়সা আছে একমাত্র তাঁকেই বিয়ে করা চলে!

—ওই দেখুন, সবাই নাচের ঘরে যাচ্ছে।—আমি কি আপনাকে—

—ধন্যবাদ! আমি আমার মায়ের সঙ্গেই যাচ্ছি।

হতাশ মেমসাহেব বিদায় নিলেন। যুবক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ১৮২৮ সনের কোন এক সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে অসংখ্য মান্যগণ্য সম্ভ্রান্তের ভিড়ে কোন এক নামহীন ইংরাজ-তরুণী সে রাত্তিরে শেষ পর্যন্ত নাচতে পেরেছিল কি না, কিংবা কোন আধ-বুড়ো ক্যাপ্টেনের হাত ধরেই ক্রমাগত পাক খাচ্ছিল কি না আমরা তা জানি না। ফরাসী অভিযাত্রী তরুণ বিজ্ঞানী ভিকতর জ্যাকমোঁ'র (Victor Jacquemont) রোজনামা

শুধু এটুকুই বলে—মেমসাহেবদের মান তখন মন্দার দিকে। কেননা, শুধু শুধু এই একটি মেয়ের বেপরোয়া কথাবার্তা নয়, জ্যাকমেঁা কলকাতায় পৌঁছাবার পর থেকেই যা দেখছেন সবই যেন মেমসাহেবদের দুর্দিনের বার্তাবহ। কলকাতায় তিনি অতিথি হয়েছিলেন তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল পীয়ারসন সাহেবের বাড়িতে। সদ্যাগত ফরাসী তরুণকে নিয়ে সে বাড়ির অন্দরে সে কি উৎসাহ! মিসেস পীয়ারসন তো আছেনই। তা ছাড়া আছেন মিস পীয়ারসন। তদুপরি মিস পীয়ারসনের গভর্নেস মিস প্যারী। মিস পীয়ারসন তাঁকে নিয়ে রাজভবনে যান। জ্যাকমেঁা যখন লেডি বেন্টিঙ্কের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেন মেয়েটি তখন দেওয়ালের বাইরে ময়দানের এক কোণে নিজের ফিটনে নিঃশব্দে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে!

অবশ্য জ্যাকমেঁা একটু অন্য ধরনের আগন্তুক। তিনি সম্ভ্রান্ত, সুদর্শন, সুশিক্ষিত; তা ছাড়া চোখে-চুলে, চালচলনে এবং পোশাকে-আশাকে স্পষ্টতই তিনি এলোমেলো দার্শনিক স্বভাবের। মেয়েরা, এমন কি মেমসাহেবেরাও যে তৎকালে কবি-দার্শনিকদের এড়িয়ে চলতে চাইতেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তদুপরি ভিকতর জ্যাকমেঁার পকেটে গোল্ডমোহর না থাকলেও মিস পীয়ারসন প্রমুখরা জেনে ফেলেছিলেন তাঁর কাছে খানকয় সোনার খনির লাইসেন্স আছে। জ্যাকমেঁা গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক-এর কাছে একটি নয়, কয়েকটি পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। এমন কি একখানা স্বয়ং লেডি বেন্টিঙ্ক-এর হাতে পর্যন্ত। কলকাতার কমবয়সী মেমেরা জেনে ফেলেছেন—তিনি লেডি বেন্টিঙ্ক-এর বান্ধব। ওঁরা এক হাতিতে চড়ে, এক হাওদায় বসে ব্যারাকপুরে হাওয়া খান; ঈশ্বর, মোজার্ট, রোসিনি, চিত্রকলা, মাদাম ডি স্তেল (de Stael), সুখ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

জ্যাকমেঁা এদেশে প্রথম 'এলিজিবল ব্যাচেলার' নন—উচ্চাভিলাষী মেমসাহেবদের দৃষ্টিকোণ থেকে তো অবশ্যই নয়। তার আগে হেস্টিংস ফ্রান্সিসের মতও পাণিপ্রার্থী দেখা গেছে এতদ্দেশে। কিন্তু সেজন্য মেম-

সাহেবদের কখনও মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপের আশেপাশ পিটিয়ে ফিরতে হয় নি, রাজভবনের ওই মেয়েটির মত কেউ কখনও ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন বলেও শোনা যায় নি। হাতে হীরকাঙ্গুরী আর ঠোঁটে রাশি রাশি স্তুতি নিয়ে নায়কেরাই বরং ঘুরঘুর করতেন ওঁদের আশেপাশে। কখনও কখনও সে সাধনায় কেউ কেউ এমন কি ঘাড়ে মই নিয়ে পাড়া থেকে বে-পাড়ায় ছুটতেও ইতস্তত করতেন না! নায়িকার জুতোয় ঢেলে তদীয় স্বাস্থ্যপান, তাঁর এঁটো করা নলে ধূমপান এবং প্রয়োজন হলে দ্বৈরথ সংগ্রাম—সবই তখন 'এলিজিবল ব্যাচেলার'দের যোগ্যতার প্রমাণ। কনের সেটা কোন্ পক্ষ তা জানার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন না কেউ—এই কলকাতাতেই মেমসাহেব তাঁর এক জীবনে এমন তৃতীয় বর পেয়েছেন—কি বয়সে, কি পদমর্যাদায় সেই প্রথমটির চেয়ে এক ইঞ্চি খাটো নন। মেমসাহেবদের ইতিহাসে সেটা, বলা চলে—স্বর্ণযুগ।

এ সুবর্ণ যুগ হঠাৎ একদিন রাত ভোরে শুরু হয়নি। তার পিছনেও গুটিকয় পলাশী বিজয়ের কাহিনী আছে। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য পেটিকোট বনাম ঘাগরা বা গাউন বনাম শাড়ির যুদ্ধটি।—কোথায় তখন 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' মেম, কোম্পানির বেপরোয়া তরুণ অভিযাত্রীদের সামনে গার্হস্থ্য জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে দুয়ারে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, বর্ণে সে ঘোরকৃষ্ণ না হলেও পরিচয়ে হয় পর্তুগীজ, না হয় ফরাসী কিংবা পুরোপুরি দিশি। তাও সাচ্চা পর্তুগীজ, সাচ্চা ফরাসী দুর্লভ—অধিকাংশই আসলে ইউরেশিয়ান বা সাদা-কালোর পাঞ্চ মাত্র। সুতরাং ১৬৭৮-৭৯ সনে যদিও মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন—চুয়াত্তরজন, তাঁদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন মাত্র ছয়জন। সেই ষড়মেমের মধ্যে একজন বিলিতি মেম, একজন ডাচ, দু'জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দু'জন ইঙ্গ-পর্তুগীজ! কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অবশ্য তখন থেকেই হেড অফিসে 'ইনডেন্ট' পাঠাতেন মেম সাহেব চেয়ে।—'জেণ্টল উইমেন এণ্ড আদার উইমেন'—যে কোন ধরনের মেম। তাদের খাওয়াপরা, ভাড়া সব কোম্পানীর দায়। অবশ্য এদেশে নামবার এক বছর পরেও যদি দেখা যায় কেউ

অবিবাহিত রয়ে গেছে তবে খোরপোষের দায় তার নিজের। এ সব সুবিধের মধ্যেই ১৬৯৯ সনে মেম সমাচার : করমণ্ডল উপকূলে সাকুল্যে সাহেব আছেন একশ' উনিশজন। তাদের মধ্যে বিলিতি বিবি পেয়েছেন মাত্র ছাব্বিশজন, চৌদ্দজন পেয়েছেন ফিরিঙ্গী, চারজন 'মাসতি', দুজন ফরাসী, একজন জর্জিয়ান। তারপরও অবশ্য ওই অঞ্চলে চৌদ্দজন বিধবা এবং দশজন কুমারী মেম ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বিয়ে করেননি। স্বভাবতই পর্তুগীজদের মতই সাহেবেরা তখন নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে দেওয়ালের বাইরে উঁকি দিতেন। ফল—সর্বজনবিদিত। 'মিসি বাবা' অর্থাৎ অবিবাহিত কুমারী মেমেরা যখন নিজেদের গরজেই এদেশে এসে পৌঁছেছেন, সাহেবরা সব ততদিনে বিগড়ে গেছেন, তাঁরা শুধু বেনিয়ান-কামিজ, পোলাও-কাবাব, নাচ আর হুঁকোই রপ্ত করে ফেলেননি—অনেকেই নেটিভদের নিয়মে 'জেনানা' রাখতে শুরু করে দিয়েছেন! কোথাও কোথাও সে বন্ধন এমন নিবিড় যে সেখানে 'ডিভাইড এণ্ড রুল' পলিসি প্রয়োগের কথা ভাবাই যায় না! কেননা, ভারতে তখন মেজর এইচ-এর মত সাহেব বিস্তর। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই ফৌজী সাহেব ফৈজু নামে একটি ভারতীয় মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন মাদ্রাজে। ফৈজুর ছেলেমেয়ে ছিল তিনটি। সবচেয়ে ছোটটি মেয়ে। সে যখন ভূমিষ্ঠ হয়—মা তখন মারা যান। মেজর সাহেব কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গিনীর অবশেষ কফিনে পুরলেন, তারপর শবাধার আর মেয়েকে নিয়ে দেশে চললেন। ছেলেরা এ দেশেই রয়ে গেল। দেশে পৌঁছে তিনি সারে-র একটি বাড়িতে আস্তানা পাতলেন। দিনরাত তিনি ঘরেই থাকেন। কদাচ তাঁকে বাইরে দেখা যায়। কিছুদিন পরে মেয়েটি মারা গেল! এবং তার কুড়ি বছর পরে একদিন বিদায় নিলেন মেজর নিজেও। প্রতিবেশীরা তাঁর ঘরের দরজা খুলে দেখলেন, মেজরের শোবার ঘরে তাঁর খাটের পাশেই আর একটি খাটে পর পর দুটি কফিনে শুয়ে আছে সেই ভারতীয় রমণী আর তার কন্যা! মেজর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ফৈজুকে নিয়েই ছিলেন। এমনি সখ্যতার আরও অজস্র নজীর ছড়িয়ে

আছে এদেশের ইংরেজের স্বল্প কথিত ঘরোয়া কাহিনীতে। শুধু চার্নক-কিকপ্যাট্রিক, স্কীনার-মার্টিন নয়—ওঁদের বিখ্যাত রোমান্স কাহিনীগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেক উইল, ছবি, কবরফলক। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে এখনও এমন তৈলচিত্র আছে যেখানে ভারতীয়বেশী সাহেব তাঁর দিশি বিবি নিয়ে সগর্বে দণ্ডায়মান—ঘরের কাছে দমদমের গোরস্থানে এমন ফলকও খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে জনৈক ম্যাকলয়েড কোন এক আটত্রিশ বছর বয়স্কা নেটিভ রমণীর জন্য গলা ছেড়ে কাঁদছে!

মেমসাহেবরা এই 'মেটেবুরুজ'টি দখল করছেন যে প্রক্রিয়ায় সেটা সনাতন জেনানারীতি বা ফেয়ার কমপিটিশন নয়। আইন, আর্তনাদ, যাজক, সরকার মিলে সে চতুরঙ্গ বাহিনীর আক্রমণ। কখনও ক্যাথলিক প্রভাবের ধুয়া উঠেছে, কখনও নৈতিকতার,—কখনও কুলকলঙ্কের, কখনও বা স্বাদেশিকতার। বেচারা সাহেব তখন বাধ্য হয়েই বেগতিক। স্বদেশের চোখে তার ইজ্জৎ নেই, সরকারী চোখে তার সন্তান সন্ততিরা প্রায় অপাঙক্তেয়। অতএব ১৮০৮ সনে ১০০ নম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে জনৈক মিস্টার অটল বিজ্ঞাপনে সাচ্চা মেম খুঁজতে বের হলেন,—'ওয়ান্টিং এ ওয়াইফ।' এবং কোন জাহাজ এসেছে শোনামাত্র নবীন প্রবীণ যেখানে যত রাইটার, ফ্যাক্টর, মেজর, সাব-অল্টার্ণ ছিলেন সবাই জাহাজঘাটায় ছুটলেন। কেননা, পত্নী যথেষ্ট নয়, তাঁদের মেম-গিন্নি চাই। স্বভাবতই অতঃপর যে কোন মেমপাত্রীর নাম—'দি নিউ-অ্যারাইভড্ এঞ্জেল'! বেচারা মধ্যবিত্ত বাপ-মা এ বাজার হাতছাড়া করবেন কেন? তাঁরা জাহাজভরা 'মিসিবাবা' চালান দিতে আরম্ভ করলেন। কনে বোঝাই সে জাহাজের বিলিতি ডাকনাম 'ফিশিং ফ্লীট',—জেলে ডিঙি,—ওঁরা মাছ ধরতে আসছেন!

নব অধ্যায় শুরু হল বটে, কিন্তু মেমসাহেবের জীবন কাহিনী তবুও 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' নয়। তাঁর সামনে তখনও অনেক খানাখন্দ,—সমুদ্র। সমুদ্রের কথাটাই ধরা যাক। তৎকালে পালের জাহাজে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে বিলেত থেকে ভারত আসার যে ঝঞ্ঝাট, যে কোন কুমারী মেয়ের পক্ষে সেটা পার্বতীর তপস্যার চেয়েও বোধহয় কঠিন

ব্যাপার। ঝড়, জাহাজ ডুবি, ডাকাতি, যুদ্ধ—বিপদের সম্ভাবনা প্রতিপদে। পূর্বদেশে আলো বিতরণের বাসনায় ঘর ছাড়া কনভেন্ট শিক্ষিত নানেরা ঠিকানায় পৌঁছাবার আগেই পথে 'লুট' হয়ে অন্য দেশে বাঁদী হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছেন—সে কালে এমন ঘটনাও ঘটেছে। দীর্ঘ পথ। জাহাজ এবং আবহাওয়া দুই-ই ভাল থাকলে সময় লাগে কমপক্ষে বারো সপ্তাহ। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীর ভাগ্যেই সে মসৃণ পথ মেলে না। ফিলিপ ফ্রান্সিসের লেগেছিল সাড়ে ছ'মাস, উইলিয়াম হিকির সাতাশ সপ্তাহ।

স্নান নেই, খাওয়া নেই,—আমোদ প্রমোদও নামমাত্র। বিশেষ করে মেয়েদের তখন আপন কেবিন থেকে বের হওয়াই নিষেধ। ওরা আপন ঘরে বসে কার্পেট বুনতেন, ছবি আঁকতেন, বাইবেল পড়তেন। বিশেষতঃ বুদ্ধিমতীরা। কেননা অভিজ্ঞ বাবা মা-রা তাই বলে দিতেন। ১৮১৭ সনে জনৈক পিটার চেরী:এই প্রসঙ্গে তাঁর কুমারী মেয়েদের পথ-রীতি সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা শোনার মত। চেরী, কোম্পানীর কর্মচারী। কর্মস্থল তাঁর মাদ্রাজ। সাহেবের দুইটি মেয়ে, বড়টির নাম—জর্জিয়ানা। বাবার ইচ্ছে, তিনি ওদের এই দেশে এনে বিয়ে দেন। মেয়েকে সে বাসনাতেই তিনি দেশে চিঠি লিখছেন। চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী সে চিঠি খুঁটিনাটি নানা নির্দেশে বোঝাই। সব মিলিয়ে তার সার কথা—সাবধান! —সাবধান! কেননা জাহাজে শুধু তোমরাই আসছ না, আরও অনেক লোক থাকবে সেখানে, হুজ কারেকটার, ময়্যালস অ্যাণ্ড বিহেভিয়ার ইউ আর আনঅ্যাকুয়েনটেড উইথ!'—তোমরা ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরু করবে, প্রার্থনা জানিয়ে দরজায় খিল দেবে। জানালা সব সময় বন্ধ রাখবে, কক্ষনো ভাল পোশাক পরে ডেকে ঘুরঘুর করবে না, তাতে অনাবশ্যক অপরিচিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে মাত্র! বাবা আরও বলছেন, ভদ্রতার খাতিরে যদি কখনও 'রাউণ্ড হাউস'-এ, অর্থাৎ জাহাজের খাওয়ার ঘরে পাঁচজনের সঙ্গে বসে খেতেই হয় তাহলে গ্লাসে সব সময়ই কিছু মদ রেখে দেবে, তাহলে কেউ পীড়াপাড়ি করে তোমাকে বেশী খাইয়ে বেসামাল করে দেওয়ার সুযোগ পাবে না। আর যদি কখনও কোন

তরুণ তোমার হাত ধরেই ফেলে তাহলে ডেকে বেড়াতে যাওয়ার সময় ছোটবোনদের সঙ্গে নেবে—অ্যাণ্ড কীপ দি কনভারসেশন জেনারেল। সাবধানী বাবা সেখানেই থামেননি। তিনি লিখছেন—মাদ্রাজে নামবার সময়েও খুব হুঁশিয়ার, ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখবে—নট টু কনসিল এনি থিং ইট হ্যাজ প্লীজড গড টু গিভ ইউ, বাট টু প্রিভেন্ট অ্যাণ্ড চেক ছ্যাট আইড্‌ল গেজ অল লেডিজ আর সাবজেক্ট টু অন ল্যাণ্ডিং।

সব মেমসাহেব সমান নয়। কোন মেম শান্ত, কোন মেম রাগী; কেউ মোটা, কেউ সরু; কেউ গম্ভীর, কেউ সুরসিকা। সুতরাং বাবার বাধ্য মেয়ে বিনীতা জর্জিয়ানাকে মিঃ ফ্রুস নামে একটি সহকাত্রী তরুণ যখন 'রব রয়' পড়ে শোনায় তখন সে বাবার কাছে সঙ্গে সঙ্গে এটাও লিখে দেয়—তুমি শুনে নিশ্চিন্ত হবে আমাদের সে আড্ডা বসে 'একজন বিবাহিতা মহিলার কেবিনে।' কখনও বা সাদামাটা মেয়েটি লিখছে—'আই হ্যাভ ফাইন ফান অ্যাট ডিনার, সাচ অ্যাজ লাফিং···।' কিন্তু ওরই প্রায় সমসাময়িক, সমবয়সী মেয়ে জনৈকা ক্যারোলিন বার্কার-এর (১৮৩১) দিনপঞ্জীতে ভাসমান দিনগুলোর রঙ অন্য। চপলা ক্যারোলিন জাহাজে ইচ্ছেমত নেচেছে গেয়েছে, দু'হাতে আমোদ লুটেছে—অপরিচিত তরুণ জোসেফ লেগেট-এর সঙ্গে নাচতে নাচতে কখনও ভেবেছে ডিসেম্বরে 'বনেট' পরার কোন মানে হয় না! এক সপ্তাহ পরে, অতএব তার ডাইরীতে লেখা পড়েছে—'লেফট অফ ফ্লানেল পেটিকোট! নিউ ইয়ার্সে ন'জন বান্ধবের সঙ্গে ভোজসভা সেরে কেবিনে বসে—'আই থট দে হ্যাড এ ডিজাইন আপন্ মি!'

তাও থাকত। জাহাজ তৎকালে এক আশ্চর্য জায়গা। সামনে অফুরন্ত:পথ, চারদিকে অনন্ত সমুদ্র, একই উদ্বেগ নারী পুরুষ নির্বিশেষ যাত্রীদের চোখে মুখে—একই উত্তেজনা, একই বেপরোয়া ভাব। সুতরাং ভারতের উপকূল স্পর্শ করার আগেই অনেক মেয়ের জীবনেই সযত্ন লালিত আকাঙ্ক্ষাগুলো সশরীরী হয়ে সামনে এসে দাঁড়াত। হেস্টিংস ভবিষ্যতের মিসেস হেস্টিংসকে জাহাজের ডেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন! উল্লেখিত ক্যারোলিন বেকারের পরবর্তী কাহিনীতেও দেখা যায়, মাদ্রাজে নামার

ক'সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল যে ছেলেটির সঙ্গে তার নাম—জোসেফ লেগেট! সব সময় এ জাতীয় সুখকর উপসংহার দেখা যেত এমন নয়। জাহাজের ডেকে কেবিনে সময় সময় অন্য কাহিনীও শোনা যেত। কলকাতার তরুণদের হকচকিয়ে দেবে বলে একটি মেয়ে লণ্ডনের সেরা সব পোশাক নিয়ে আসছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হয়, সাত-রানীর ধনমাণিক তার সেই তোরঙ্গটি নেই! কোন 'কম্পিটিশনওয়ালী', অর্থাৎ কোন ঈর্ষাপরায়ণা মেম হয়ত এক ফাঁকে সেটি সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছেন। কখনও কখনও তার চেয়েও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটত সমুদ্রের বুকে। ১৭৭৮ সনের কথা। মিস এলিজাবেথ ম্যানসেল নামে এক কম-বয়সী মেম আসছিলেন মাদ্রাজে। কাকা তাঁর কাউন্সিলের একজন মেম্বার। মাদ্রাজে নামার পর আদালতে অভিযোগ উঠল ক্যাপ্টেনের নামে। তিনি নাকি মেয়েটির ধর্ম হরণ করেছেন। বিচারকের ভাষায় তাঁর অপরাধ—'টেকিং অ্যাওয়ে গার্লস ক্যারেক্টার!'

হেস্টিংস-এর আমলে লণ্ডন থেকে কলকাতায় আসতে একটি মেয়ের জাহাজ ভাড়া লাগত পাঁচশ' পাউণ্ড। তার ওপর নানা বিভ্রাট। সে সব মিটিয়ে মেমসাহেব যদি একবার কোনমতে এদেশের মাটিতে পা দিতে পারেন তবে আপাতত তাঁর আর কোন ভাবনা নেই। কেননা, আনাগোনা সেই জাহাজঘাটা থেকেই শুরু হয়েছে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ যদি একান্তই ভাব না লাগে তবে আরও পাঁচটা জায়গা আছে। ক্যান্টনমেণ্টে এবং হিলস্টেশনগুলোতে এমন সাহেবও আছেন যাঁদের পণ—সেখানে যে মেয়েটি আগে পৌঁছবে তাঁকেই বিয়ে করবেন,—'দি ভেরি ফার্স্ট ইয়ং লেডি হ্যাট কাম্স আপ!' ভাগ্য ভাল থাকে তো বড় শহরেও এমন শৌখিন জুটে যেতে পারে। সেবার জনৈক মিস ওয়ার্ড এসে নেমেছেন বোম্বাইয়ে। তাঁকে দেখে গভর্নর স্যার জন গেয়ার স্থির করে ফেললেন, মেয়েটিকে তিনি পুত্রবধূ করবেন। মিস ওয়ার্ডের সেটা জানবার কথা নয়। তিনি অযথা সময় নষ্ট না করে একজন কেরাণীকে ভালবেসে ফেললেন। পরক্ষণেই যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। খবর শুনে

গভর্নর রেগে আগুন। তিনি ঘোষণা করলেন, এ বিয়ে অবৈধ। ওয়ার্ড পুত্রবধূ হয়ে নতমস্তকে তাঁর প্রাসাদে এলেন। ক'দিন পরেই নতুন প্রণয়ী আবিষ্কৃত হলেন। তিনি একজন শিক্ষক। মেয়েটিকে 'গুড ইংলিশ' শেখাবার জন্য গভর্নর তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন! আশ্চর্য এই. মাননীয় গভর্নর কিন্তু তবুও পুত্রবধূকে ঘর ছাড়া করতে রাজী হলেন না। পরিবর্তে তিনি গৃহশিক্ষককে কয়েদ করে দেশে চালান দিয়ে দিলেন।

অতএব, মেমসাহেবের সেদিন খাতিরের অভাব ছিল না। এদেশের রাজাবাদশারা সাধারণত তাদের এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু স্ব-মেলে লোকাভাব ছিল না। এমিলি ইডেন উনিশ বছর বয়সের একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সে এরই মধ্যে দু'জন স্বামীকে স্বর্গে পাঠিয়েছে, উপস্থিত এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রী হিসেবে আছে। অবশ্য কামিংয়ের মত উন্নাসিকও ছিল। কলকাতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—'অ্যালাস। দিস ফেমাস সিটি ডাজ নট কনটেন এ সিঙ্গল প্রেটি গার্ল!' অন্যরা অবশ্য তত খুঁত-খুঁতে নয়। কিন্তু সে অনুপাতে সুখ কতখানি ছিল সেটা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। পৃথিবীর আর পাঁচটা জায়গার মত ভারতেও অবশ্যই বিস্তর সুখী-দম্পতী ছিলেন। লাটবাহাদুর বা প্রধান সেনাপতির মত ওপরতলাকার গিন্নিদের কথা বাদই দিচ্ছি। অপেক্ষাকৃত নিচু দিকেও এমন অনেক মেম ছিলেন যাঁরা নিজেদের আচারে-আচরণে, জীবন ভঙ্গীতে জানিয়ে গেছেন—তাঁরা সুখী ছিলেন। যথা—মিসেস বীমস, মিসেস লয়াল, মিসেস মূলক প্রভৃতি। মিসেস বীমস বীমস-গৃহিণী হওয়ার আগে ভবিষ্যতের স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ভারতের প্রান্তরে ডাকগাড়ি আর পালকি চড়ে শত শত মাইল ভ্রমণ করেছেন; বিয়ের পরও সে বেপরোয়া জীবনে তাঁর বিরক্তি দেখা যায় নি কোনদিন। কলকাতা থেকে পেশোয়ার হাজার মাইলের পথ, লয়ালকে সেখানে যেতে হবে। শুনে স্ত্রীর জিজ্ঞাসা—আমি সঙ্গে যেতে পারি কি? এমনি আরও অনেক নজীর দেখা গেছে মিউটিনি এবং আরও নানা বিপর্যয়ের মুহূর্তে। কিন্তু তবুও মেমসাহেবের গল্পে এগুলো কয়েকটি বাংলোর খবর মাত্র। অন্যত্র হাহাকার বিস্তর।

অবশ্য সেটা মেমসাহেবের অপরাধ নয়। অপরিচিত পরিবেশ, অপরিচিত দেশ। সমাজ নেই, সংসার বলতে ক্লান্ত, অসুস্থ, কাজে নিমজ্জিত স্বামি, রুগ্ন সন্তানেরা। দুরন্ত দেশের অসহ্য আবহাওয়া তিল তিল করে ওদের কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসহায় মেম জানেন না, তিনি কী করে অবশিষ্ট দিনগুলো কাটাবেন! কেউ কেউ তারই মধ্যে বিলিতি রঙ ছিটিয়ে নিতেন। মেমেরা তখন নিজেদের মধ্যে কোন্দল করতেন। ১৭০৬ সন এই কলকাতার কউন্সিল হঠাৎ একটি চিঠি পেয়েছিলেন, আর্থার কিং নামে স্থানীয় একজন ফ্যাক্টরের কাছ থেকে। তার মর্ম : গীর্জায় আমার স্ত্রী আপন মর্যাদা পাচ্ছেন না, একজন সার্জন গৃহিণী তাঁর আসন দখল করে নিয়েছেন।—আমি এর প্রতিকার চাই। পরচর্চা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া তখন প্রত্যহের ব্যাপার। ঘোড়ায় চড়া, নৌকাবিহার, থিয়েটার দেখা, ভোজে খাওয়া আর নাচের আসরে যোগ দেওয়া ছাড়া মেমসাহেবের অবসর জীবনে আর আর একটি কৃত্য ছিল—লেখা। ভ্রমণ কাহিনী, ডাইরী, জার্নাল—মেমসাহেব ভারতে এক বিস্ময়কর কলমধারিণী। তবে সবচেয়ে বেশী লিখেছেন ওঁরা যে বস্তুটি তার নাম—'চিট।' টুকরো কাগজে লেখা ওই চিঠির মাধ্যমেই এক পাড়ার মেম যোগাযোগ রাখতেন অন্য পাড়ার সঙ্গে। চৌরঙ্গীর মেম কথোপকথন চালাতেন খিদিরপুরের মেমের সঙ্গে। 'চিট' লেখা, ভাঁজ করা, বন্ধ করা—এবং সেগুলো চালাচালি করার কৌশল উদ্ভাবন তখন মেমসাহেবের অন্যতম মাথার কাজ। কলসওয়ার্দি গ্রান্ট লিখেছেন—'মোর নোট পেপার ইজ কনজিউমড ইন ক্যালকাটা অ্যাণ্ড আদার প্রেসিডেন্সীস দ্যান ইন লণ্ডন, এডিনবরা, ডাবলিন অ্যাণ্ড প্যারিস পুট টুগেদার!'

কিন্তু এত কাগজ ছড়াবার পরও সংসার তবুও যেন সমুদ্রে ভাসমান কাগজের নৌকো। কখন ডোবে তার স্থিরতা নেই। মেমসাহেব স্বভাবতই আর স্বাভাবিক অস্তিত্ব নন। তিনি কখও নেচে নেচে নিঃশেষিত হয়ে যেতে চান, কখনও যদৃচ্ছ খেয়ে কখনও বা শুধু চুপচাপ বসে বসে দিনগুলো কাটাতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান। এমিলি ইডেন

এক সঙ্গে দেখা তিন মেমের বিবরণ দিচ্ছেন : একজনের মেজাজ সব সময় তিরিক্ষি, তিনি ঘর ছেড়ে বের হন না ; অন্যজন চোখে কম দেখেন, তিনি সবসময় বারান্দা সাইজের শেড দেওয়া একটা টুপি পরে থাকেন ; তৃতীয় জনের শরীর ভাল যাচ্ছে না, তিনি মাথা মুড়িয়ে ফেলেছেন ! মেম-সাহেবের ট্রাজেডি সেখানেই শেষ নয়। একজন মেম স্বদেশের মেয়েদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে চিঠি লিখলেন—সত্য বটে আমি আজ বিবাহিত। যাঁর সন্ধানে আমি এখানে এসেছিলাম, সে স্বামী আমি পেয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশে থাকতে যা আমার ছিল, আমি সেই সুখ হারিয়েছি। আমার স্বামী সম্পন্ন। হয়ত আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশীই অর্থ আছে তাঁর ; কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য নেই ; তার চেয়েও বড় কথা তাঁর মেজাজটিও আজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।...তাঁর পালকি বয় যে বেহারাগুলো ওঁর কাছে আমি তাদেরই মত একজন ক্রীতদাসী মাত্র !...' কখনও কখনও ঘরের কথা বাইরেও ছড়িয়ে পড়ত। অধৈর্য সাহেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেন—আমার স্ত্রী আমাকে না-বলে-কয়ে চলে গেছে। তাঁর কোন আচরণের দায়িত্ব অতঃপর আর আমার নয়। স্ত্রী আবার বিজ্ঞাপন ছাপিয়েই উত্তর দিতেন তার—আপনারা জেনে রাখুন আমার স্বামী একজন অমানুষ! ১৮১৫ সনে এই কলকাতায় জনৈক চার্লস লোপস আর তাঁর স্ত্রী এইভাবেই একটি গৃহদাহের খবর শুনিয়েছিলেন কলকাতাবাসীকে।

তবুও এদেশের ইংরাজ-কাহিনীতে সাহেবদের পাশে পাশে মেম-সাহেবরাও এক অপ্রতিরোধ্য জগৎ। ফরাসী আগন্তুক জ্যাকমেঁা রাজ-ভবনে একটি মেয়ের কথাবার্তা শুনে মনে মনে হাসতে পারেন, কিন্তু রূঢ়তম ইংরাজটিরও সাধ্য নেই তিনি অতীতের দিকে তাকিয়ে একবার হাসেন। কেননা সব মিলিয়ে সে সত্যিই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য,—'এলাম দেখলাম, হারিয়ে গেলাম।' 'অ্যাণ্ড নাউ দেয়ার ডাস্ট ইজ অন এ থাউজেণ্ড হিলস !' ট্রাজেডি আরও ঘন। এমন করে ভারতের ধুলোর মিশে যাওয়ার পরেও মেম-সাহেব আজ আমাদের কাছেও বেঁচে নেই। এমন কি ফ্রক পরা ওই মেয়েটিও জানে না 'লেডিকেনি' নামে যে মিঠাইটি সেটি একজন মেমসাহেবের নাম।

॥ 'খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম' ॥

অঘটন আজও যখন ঘটে তখন সেকালেও নিশ্চয় ঘটতে পারত। আর কিছু নয়, অন্তত এটুকু যদি ঘটত, রামের আগে রামায়ণের মত ডিসেম্বরটা যদি কোনমতে নভেম্বরের কয় পা আগে চলে আসতে পারত, তা হলে আমি মা মেরীর নামে হলপ করে বলতে পারি বড়দিন কিছুতেই এমন বড় হতে পারত না। অন্তত এই কলকাতায়। তা সুয়েজ খাল আরও চওড়া করে কাটলেও না—শুধু লালাবাজার এলাকায় নয় এন্টালী, বাগবাজারে 'জেরুসালেম কফিহৌস'-এর আরও গোটাকয় ব্রাঞ্চ খুললেও না। কেননা, বড়দিন যেমন কখনও জাহাজে চড়ে আসে না তেমনি সেণ্ট জন চার্চের ঘণ্টায় বা জেরুসালেম সাইনবোর্ডেই আসে না। বড়দিন আসে ভিজে ঘাসে, গেঁজে-যাওয়া খেজুর রসে, ঘন কুয়াশার সন্ধ্যায়, থোকা থোকা ফুলের ভোরে। শুধু তাই নয় আমরা যাকে বড়দিন বলে জানি এবং মানি সেদিন আসে আরও বিছিত্র ছন্দে—ঘোড়ার ক্ষুরে, পিকনিকের হুল্লোড়ে, ফ্যাশান জার্নালের পাতায়, নিউ মার্কেটের কাঁচে, দর্জির কাঁচিতে, ভেটের ডালিতে এবং খেতাবের লিস্টিতে। কোথায় আগে, কোথায় পরে সে সম্পর্কে সকলের টেস্টামেণ্ট অবশ্যই একমত নয়; কিন্তু আমার দৃঢ় অভিমত বুড়ো সাণ্টা ক্লজ-এর থলি থেকে এগুলো ঘড়ি ধরে একযোগে ২৬শে বেরুলেও কিছুতেই সেদিনটি বড়দিন হত না—যদি মাসটির নাম হত জুন।

কারণ স্পষ্ট—এন্টালীর কীর্তনীয়ারা যত আবেগ ভরে, যত ভক্তি বিনম্র চিত্তেই খোলের বোলে একথা বলে যান না—

> '...তুমি প্রেম-বলে ধরাতলে বিজয়ী হইলে।
> তোমার প্রেমরসে (যীশু হে,
> ও আমার দয়াল যীশু)

তোমার প্রেমরসে, বঙ্গদেশে,

মাতাও সকলে ॥'

কিংবা তালতলার ভক্ত যত আস্থাভরেই ঘোষণা করুন না কেন—

'আসিবে সেদিন, আসিবে নিশ্চয়

গাহিবে যেদিন বঙ্গ যীশুর জয়'

বড়দিন অন্তত ইংরেজ ছাড়া জমে না, জমতে পারত না। এবং এমন সেন্ট অগাস্টিন নিশ্চয়ই কেউ আজ অবধি জন্মান নি—জুনের কলকাতায় যিনি ইংরেজকে দিয়ে বড়দিন করান।—বড়দিন তো আর সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে লড়াই নয়।

নাচ গান হল্লা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় তথা তস্য অশেষ করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন—ইত্যাদি যাবতীয় কৃত্য সমুদয় তখন সম্পন্ন হত ডিসেম্বর নয়, নভেম্বরের ১৫ তারিখে। কেননা যীশুর আগামী জন্মদিনের চেয়ে ইংরেজদের কাছে তখন অনেক অনেক বেশী জরুরী—নিজেদের বেঁচে থাকার দরকার। নভেম্বরের আগের মাসগুলো তখন ইংরেজীটোলায় মৃত্যুর মরসুম। কলেরা, রক্তআমাশা, পালা জ্বর;—পলাশীর মত মাঠে মাঠে যেমন তখন এলাম-দেখলাম-জিতলাম, ঘরে ঘরে তেমনিও নামলাম-শয্যা নিলাম-প্রভুর কাছে ফিরে গেলাম। ইংরেজের তখন বড়দিনের অবসর কই? গরম আর বাদলের দুঃসহ রাতগুলো পার করে দোর খুলে তাঁরা ছুটে আসতেন —কে গেল আর ডিসেম্বরের জন্যে কে রইল তারই হিসাব মিলাতে। সে বিয়োগফল অনিবার্য ভাবেই বড় রকমের কিছু দাঁড়াত না। ফলে যাকে বলে বড়দিন সেকালে ঠিক তা হত না।

তা ছাড়া ইংরেজরা শুধু পাকা খ্রীষ্টানই নন পাকা সংসারীও বটেন। ফলে 'কিং অব কিংস' তথা ভাবের রাজাধিরাজ যীশুর জন্মদিনের চেয়েও তাঁদের কাছে গুরুতর তখন—'কিংস বার্থ-ডে' তথা ইংল্যাণ্ড নামক মাটির দেশের রাজাবাহাদুরের জন্মদিন; মানবপুত্রের কবর থেকে উঠে আসার চেয়েও স্মরণীয় হায়দর পুত্র টিপুকে কবরে পাঠাবার দিনটি। কলকাতায় তখন শ্রীরঙ্গপত্তমের বিজয় তারিখটিও বড়দিনের চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব।

রাজভবনে উৎসব তখন প্রাত্যহিক ঘটনা। শুধু 'বড়াখানা' বা ডিনার নয়, 'বল' বা নাচের আসর নয়—লাটভবন তখন ক্লাবের মত। ব্রেক-ফাস্ট, টী, সাপার—চা ডালমুটের জন্যেও নবাগত সাহেবেরা তখন নেমন্তন্ন পেতেন লাটভবনে। ওয়েলেসলি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, প্রতি মঙ্গলবার দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত বাইরের মানুষকে নিয়ে তিনি আড্ডা দিতেন। বেন্টিঙ্ক মিলিটারী সিবিল সরকারী কর্মচারীদের ছাড়া অন্যদেরও ডাকতে লাগলেন। অকল্যাণ্ড মেয়েদেরও আহ্বান জানালেন। ক্রমে দেশীয়রাও ছাড়পত্র পেলেন। এতে আগামী বড়দিনের পূর্ববর্তী রাত্রিটি হ্রস্বতর হয়েছে বটে —কিন্তু উৎসব হিসেবে বিশুদ্ধ রাজকীয়গুলোর মাহাত্ম্য কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত বিন্দুমাত্র খাটো হয় নি। ১৭৯৯ সনে টিপুর পতন। ১৮০০ সনের ফেব্রুয়ারীতে ওয়েলেসলি আটশ' ইংরেজ নারী-পুরুষের খানা-পিনা-নাচা-গানার যে স্মরণোৎসব করেছিলেন তেমন উৎসব বোধ হয় কলকাতার কোন বড়দিনেই হয় নি। এমন কি বহু পরে, ১৯০৩ সনে শ্রীরঙ্গপত্তমের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কার্জন জানুয়ারীর ২৬ তারিখে যে উৎসব করে গেছেন—কলকাতা কোন ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে কোনদিন তা দেখেছে কি না সন্দেহ।

আসল কথা আগে পাকাপাকি সুদিন, তারপর বড়দিন। প্রথমটি যেমন একদিনে আসে নি, কলকাতার বড়দিনও তেমনি রাতারাতি এমন বড় হয়ে ওঠে নি। সে কাণ্ড আরও অনেক কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ডের অনুসারী মাত্র, সে বড় আরও অনেক বৃহৎ-এর সহচর মাত্র। মনে রাখতে হবে, গুপ্তকবি যখন লিখছেন (১৮)—

> 'খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম।
> বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধাম'—

তখন কলকাতাই শুধু বড়বয়স্ক শহর নয়, এখানে তখন সবই বড় বড়। —লাটসাহেব-বড়লাট, দুপুরের খাওয়া মানেই বড়াখানা, সাহেব মানেই— বড়াসাহেব, আর—দিশি কেরানী মানেই বড়াবাবু। বড়দিনের পেছনে এঁদের প্রত্যেকের দান স্বীকার করতেই হবে—অসামান্য।

প্রথমে বড়লাটদের কথাই বলি। বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রথমেই তাঁরা স্মরণীয় কারণ—তাঁদের স্পর্শ ভিন্ন কলকাতায় সেকালে কোন রাতই পোহাত না। ওঁরা গির্জায় গেলে তবে ইটের বাড়ি মন্দির হত, ওঁরা আট ঘোড়ার গাড়িতে পুরোভাগে থাকলে তবে ভক্তরা চলৎশক্তি পেতেন। গোড়ার দিকে অবশ্য এসব গমনাগমনে রবিবারের সকালগুলোকে মাটি করার প্রশ্ন ছিল না। রবিবারে ছুটি এসেছে বাংলা ১২৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। বাঙালী পাবলিকের অবশ্য ধারণা হয়েছিল—তার কারণ নিশ্চয় রুশ আক্রমণের ভয়। খবরের কাগজে দেখা যায়—নানা ধরনের 'আকাশভেদী গল্পে' তখন কলকাতা মশগুল। কেউ বলছে—ছ'খানা রুশ জাহাজ আসছে, কলকাতা লুঠ হবে—কেউ বলছে তা নয়, নিশ্চয় ইংরেজের অন্য কোন মতলব আছে। কিন্তু ইংরেজ জানত—আসল কারণ কোথায়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধেও "we have before us a printed horse racing account for a Sunday,……we are astonished and shocked·· !'

বিলেত থেকে তারা কড়া চিঠি পেয়েছে—রবিবারেও ঘোড়ার পেছনে ছুটছ তোমরা!—সত্যিই এতটা ভাবতে পারিনি আমরা!

এই ঘোড়া, যার ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে এখনও বড়দিন আসে আমাদের এই শহরে—বলতে গেলে তাও বড়লাটেদেরই অবদান। নিয়মিত ঘোড়দৌড় শুরু করেছেন বটে অন্যরা কিন্তু মনে রাখতে হবে, অশ্ববিদ্যার প্রথম বিদ্যায়তনটি খুলেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। কলকাতার প্রথম ঘোড়দৌড় সম্ভবত ১৭৬৯ সনে, খেলা হত গার্ডেনরীচে, আকরার মাঠে। তবে নিয়মিত খেলার শুরু আরও কিছু পরে, ১৭৯৮ সনে। আখড়া ছিল আজকের মাঠের উল্টো দিকে এলেনবরা কোর্স। কলকাতা টার্ফ ক্লাব এসেছে আরও পরে, ১৮৪৭ সনে। আর ঘোড়া ঘিরে অলিতে গলিতে বড়দিনের হাওয়া?—ক্রমে ক্রমে। প্রিন্স অব ওয়েলস, দারভাঙ্গা, কোচবিহার—গেলাস্তন, 'সেম্পেন চার্লি', জাফর—সে বৃত্তান্ত সম্ভবত যে-কোন বাজি-জেতা ঘোড়ার বংশতালিকার মতই রোমাঞ্চকর। জাফর

প্রথম দেশী সওয়ার। মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের মতই সুদূর ১৮৭৩ সনে বাজি জিতে সে আমাদের জাতীয়তার মুখরক্ষা করেছিল। সেস্পেন চার্লির খ্যাতি—সে ইংরেজের মুখের রঙ আরও উজ্জ্বল করেছিল। তুখড় এই সওয়ারটি কলকাতায় নামে—১৯০৯ সনে বা তার কাছাকাছি। নেমেই সে ঘোষণা করলে—যতদিন কলকাতায় থাকবে ততদিন সে এখানকার জল (অন্ন নয়) স্পর্শ করবে না। কেননা 'দি হুগলী পানি' তথা গঙ্গাজলের রঙ তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। চার্লি পাকা পাঁচ বছর সত্যিই জলের কাজ অন্য তরলে সেরেছিল; কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন শেষরক্ষা করতে পারেনি বেচারা। মারা গিয়েছিল শুধু অন্নহীন অবস্থায় নয় —গঙ্গাজল মুখে নিয়ে!

আমাদের গঙ্গোদকের অভাব ছিল না, বাঙালীটোলায় ঘাট ছিল যা সে চার্লির। সুতরাং, ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীবাবুরাও চার্লি সাজতে চললেন,—তাঁরাও রেসের মাঠ খুললেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর পুরাতন প্রসঙ্গে লিখেছেন সে মাঠটি ছিল উত্তর কলকাতার পোস্তর রাজা নরসিংহের বাগানে। প্রধান উদ্যোক্তা তথা খেলোয়াড় ছিলেন—ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু এবং হাটখোলার দত্তবাবুরাও। ওঁদের পূর্বপুরুষেরা বুলবুলি খেলতেন, ওঁরা বনের চিড়িয়া আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মাটিতে নেমে এলেন। পাখির নেশা তখন নিবেদিত পক্ষীরাজের পায়ে। ১৮৩৭ সনের ৭ই জানুয়ারীর খবর—'গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীল শ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাহাতে সুদর্শনার্থ যে সকল বস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতি সুদৃশ্য দুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল। তাহার এক গাড়ু শ্রীল শ্রীযুক্তের ব্যয়ে পিটার কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়টা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হ্যামিল্টন কোং কর্তৃক নির্মিত হয়। শেষোক্ত গাড়ুর ওজন হাজার ভরির ন্যূন নহে···এই উভয় মহা তৈজসই আগামী ঘোড়দৌড়ে পুরস্কারার্থ প্রদত্ত হইবে। ('সংবাদ প্রভাকর')

বিদেশী রাজা আর দিশি 'প্রিন্স'দের আন্তরিক উৎসাহে কলকাতার বড়দিনের মরসুম তখন ক্রমেই আরও গরম।

খানা-পিনা নাচ-গান, পিকনিক শিকার—বড়দিনের অন্যান্য উপচার-গুলোতেও রাজবাড়ির অনেক দাম। আগেই বলেছি—'ফিস্ট' এবং 'বল' লাটভবনে চিরকালই বারোমাসে তের পার্বণ। ভোজ টেবিলের সে মাহাত্ম্য খর্ব হয় কর্নওয়ালিসের আমলে। তার আগে লাটভবনে ভোজসভা ছিল কলকাতার অন্যতম সামাজিক উৎসব। হিকি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন—সে উৎসবে প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই হীরা পান্না চুনি মুক্তা এবং মেয়েদের বাহারে পোশাক—কিন্তু তার চেয়েও লোভনীয় বোধ হয় মাননীয়া জেনানাকুলের চোখের জেল্লা।—কত মনে যে প্রমেথিউসের আগুনের কাজ করত তা!

তেমন তেমন অগ্নিকণার নেশা পেয়ে গেলে নৃত্য শেষে পতঙ্গের রঙ্গে ওঁরা পালকির পিছু পিছু বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতেন। হিকির আত্ম-কাহিনীতে সে ধরনের ঘটনারও স্বচ্ছন্দ বিবরণ আছে।

লাটভবনের অনুকরণে বেলাটদের ঘরে ঘরেও তখন নাচের আসর বসত—'thirty people at breakfast, fifty at dinner, supper at midnight, dances till daylight,'

—তখন আইবুড়ো সাহেবদের ঘরেও গার্হস্থ্য নিয়ম। সেখানে কে কার সঙ্গে নাচল, সেটা যেমন তৎকালে শহরের খবর, ('Who danced with whom and who is like to wed, and who is hanged, and who is brought to bed'.)

তেমনি—কী পোশাকে নাচল সেটাও।

একজন সুরসিকা শ্বেতাঙ্গনা লিখে রেখে গেছেন, কলকাতায় আয়না লাগে না—'The attention and court paid to me was astonishing; my smile was meaning and my articulation melody…'

কিন্তু তা হলেও নাচের আসরে, বিশেষ, বড়দিনের সর্বজনীন আনন্দ-মেলায় কে কী সাজে যোগ দেবে, তা নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না। গিন্নী-

দের হাতে একালের মত সেকালেও সময় ছিল বিস্তর। কিন্তু কাঁচি নিয়ে কাটাকুটি করার সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম। কারণ সেকালে ফ্যাশান জার্নাল ছিল না। খবরের কাগজে তখন যতই মেয়েলী স্বভাব থাক, একান্তই তার পুরুষালী চেহারা। সেখানে ছিটকাপড়ের রঙীন বিজ্ঞাপন তখন একেবারেই অভাবিত। অথচ সুয়েজের আগে পর্যন্ত, লণ্ডনের শেষ গাউনের ডিজাইনটি কলকাতায় পৌঁছাতে সময় নিত গড়ে ছ' মাস। সুতরাং, আটটায় প্রাতঃ-রাশের পর বেলা বারোটায় 'টিফিন' খেতে খেতে মেয়েরা অনিবার্যভাবেই যে বস্তুটিকে ঘিরে বৈঠক জমাতেন, সেটা গত রাত্রে দেখা কোন নবাগতার জুতোর গড়ন, অথবা ব্লাউজের উন্মুক্ত এলাকার পরিমাপ। মাঝে মাঝে নবাগতাদের দেহ ভর করে বিস্ময়কর বস্তুসমুদয়ও আবির্ভূত হত কলকাতায়। ১৭৯৩ সনে একবার যেমন হয়েছিল। সেবার একদঙ্গল মেয়ে এমন পোশাকে এসে নামলেন যে, দেখে কলকাতার চক্ষুস্থির।—সবাই যেন একসঙ্গে মা হাতে চলেছেন।

'—this was the no-waist system from adopting which every girl appeared to be big with child !'

এক ডাচ ভদ্রলোক নাকি এক নাচের আসরে এই পোশাকে কুমারী মেয়েদের দেখে আঁতকে উঠে বলেছিলেন—'Ah ! God help their poor parents !'—এমতাবস্থায় নিজের কন্যাদের দেখতে পেয়ে বেচারারা না জানি কী মনঃকষ্টই ভোগ করেছেন।

কলকাতার মেমসাহেবেরা সেসব 'বিবেকবান'দের দীর্ঘশ্বাসে কান না দিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে ওস্তাগর ডেকে পাঠাতেন। ডিজাইনটা মনে থাকতে ফরমাইশটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। এছাড়া বড়দিনের হাটে তাঁদের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। কেননা, ১৮৪৯ সনে কলকাতায় মদের দোকান ছিল যেখানে পঁচিশটি, সেখানে মেমসাহেবদের টাকা ওড়াবার মত মনোহারী দোকান ছিল—মাত্র বারোটি। মেডিরা থেকে বছরে গড়ে দেড়শ' থেকে দুশ' পিপা 'মদিরা' আসত যেখানে, সেখানে কলকাতার মত সাম্রাজ্যের 'সেকেণ্ড সিটিতে' 'ইউরোপ শপ' বলতে ছিল মাত্র দুটি।

একটি তার 'পিটার অ্যাণ্ড লেটলি', অন্যটি—'মাদাম শেরভোতিস'। তারপর মেমসাহেবের নিজের সওদা যা, সব 'বক্সওয়ালার' বাক্সের ভেতর। নিউ মার্কেট তখনও জন্মায়নি, তার দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে ১৮৭১ সনে—বাক্স-মাথায় ফিরিওয়ালাই তখন বড়দিনের একমাত্র সান্ত্বনা,—বুক-বেল-ক্যাণ্ডেল থেকে স্কার্ট-ব্লাউজ, খেলনা-পুতুল, সব তার ভেতর।

বড়দিনের হাট যেমন সেকালে প্রধানত ফেরিওয়ালার দায়িত্ব, তেমনি বড়াখানার কৃতিত্বও প্রধানত মগ-গোয়ানীজ, বাটলার-বাবুর্চির।

"কট্ কট্ কটাকট টক্ টক্ টক্।
ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঢক্ ঢক্ ঢক্॥
চুপু চুপু চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্॥..."

শুধু 'কারি আর রাইস' নয়, নিউ ইয়ার্স-এর ভোজের টেবিলে যে-বাদ্য ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের শুনিয়েছেন—তার অনেকখানিই মেমসাহেবদের অজ্ঞাতে বাবুর্চিদের হাতে রচিত। মেমসাহেবরা তখনও হেঁশেল ঠেলার কাজ ধরেন নি, বাঘিনীগোছের গৃহিণী হলে টেবিলে বসেই লিখিত মেনু তলব করতেন বড়জোর। শোনা যায়, একবার বড়দিন উপলক্ষে এক সুশিক্ষিত বাবুর্চি, তার তৈরী ডিশের যে তালিকাটি প্রস্তুত করেছিল—তা ছিল নিম্নরূপ :

SOUP
FIS
MADISH
JOINT
Salary soup
Russel pups, wormsil mole, Roast Bastard
TOAST
Anchovy poshteg
PUDDIN
Billumunj, Ispunj rolf. Heel Fish Fry

মেমসাহেবের হুকুম ছিল টার্কি ডেভিল করতে হবে। বাবুর্চি ক্ষমতায় বিশ্বকর্মা। টার্কি না পেলে সে পার্শী বয়েৎ দিয়েও ডেভিল করতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল এই, সাহেবকুঠিতে থেকে থেকে সে শব্দটার মানে জানে। হক না মুরগী, মেমসাহেব যদি অন্যরকম বোঝেন! সুতরাং—ডেভিল টার্কি না লিখে, সে লিখল—'D—d Turkey'। শোনা যায়, সে-বছর এমন বড়দিন জমেছিল যে, মেমসাহেব খুশি হয়ে সরাসরি 'বুটলিয়ার সাহেবের' পদে বসিয়ে দেয় তাকে। 'বুটলিয়ার'-এর অ্যাংলিশ—'বাটলার"।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে বড়দিনে কৃত্য তখন চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের টিকিটের জন্য 'নম্বর লাগানো' নয়—শিকার অথবা নৌবিহার। শিকারের মস্ত জায়গা তখন কলকাতা থেকে মাইল পনের দূরে—বাকরা (Buckra)। গণ্যমান্য সাহেবরা সদলবলে শিকার করতে যেতেন সেখানে। অবশ্য শিকার মানে, কদাচিৎ বুনো শূয়র, অধিকাংশ সময়েই—শেয়াল। লর্ড মিণ্টো, লর্ড আমহার্স্টের মত লাট-বাহাদুররা পর্যন্ত শেয়াল মেরে শিকারী হতেন সেকালে। বলা বাহুল্য, তাতে যুগপৎ দু'কাজই হত। বড়দের যেমন বড়দিনের ছুটিটা কাটত, কমদরী ছোট-সাহেবরাও তেমনি সার্কাস দেখার মজা পেত—এবং যাকে বলে বড়দিন টাউন কলকাতা, তাই দেখে খ্রীষ্টমাহাত্ম্য জানতে পেত।

তবে বড়দিনের আসল মাহাত্ম্য বোধহয় তদুপলক্ষে বাঙালী পাড়ার বড়বাবুদের জীবন।

'কেরানী দেয়ান আদি বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট॥'

সন্দেহ নেই, শেষ ছত্রের শেষ শব্দটিই আজও বাঙালী পাড়ায় বড়-দিনের প্রাণভ্রমরা; 'নিউ ইয়ার-ডে'র তোপধ্বনির চেয়েও সেদিন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে তার তাৎপর্য। নয়ত হলই বা সখেদে, কিপলিং কী করে লিখলেন—'We are richer for one mocking Christmas past past !'

কিন্তু আমাদের বড়দিনের তাই একমাত্র খবর নয়।

"যে সকল বাঙালীর ইংলিশ ফ্যাশন।
বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরন॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার॥
বাবুগণ বাবু নন—নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি বহুরূপী লুকোচুরি খেলা॥
দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা॥"

এ খবরগুলো আজ বোধহয় প্রাচীন-সমাচার নয়। সাহেবরা এসেছিল বলেই বেথেলহাম থেকে বহদূরে, এই ভাগীরথী তীরে বড়দিন এমন প্রকাণ্ড বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সাহেবরা চলে গেছে বলেই বড়দিনও পালিয়ে গেছে এমন ভেবে মন খারাপ করবার কোন হেতু নেই। —যা আসে, তাকে না ফিরতে দেওয়াই না আমাদের চিরকালের স্বভাব! বড়দিন আমাদের দিয়ে গেছে যা, সেও কম নয়। মনে রাখতে হবে, সাহেব তাড়ানোর আদিমন্ত্র যা, সেও এই বড়দিনের আড্ডাখানা থেকেই নাকি উপ্ত। কংগ্রেসের তখন নাম ছিল—'বড়দিনের তামাশা।' এবং কে না জানে, সে-তামাশার আদি সাহেবেরাই! তারা নেই, তাই বলে কি বড়দিন শুধু আজ সার্কাসের তাঁবুতেই। বোধহয় নয়। কলকাতায় অন্তত বড়দিন 'ঈশু খ্রীষ্টী হাঙ্গামা' মাত্র নয়। বড়দিন কলকাতার একান্ত আপন-ঘটনা। চোখ খুললেই দেখতে পাবেন—আছে, সব আছে। সেই ভেট, সেই তামাশা, সেই বহুরূপী লুকোচুরি খেলা। পার্ক স্ট্রীটে, চৌরঙ্গীতে গায়ে আবছা কুয়াশার মায়া জড়িয়ে 'ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধরে', 'বিবিজান' এখনও তেমনি 'চলে যান লবেজান করে।' এ বিবি সেদিনের মত আজ অনিবার্যভাবেই যীশুর কেউ হবেন এমন নয়, কিন্তু বড়দিন তাঁর মন্থর পায়ে —চোখের তারায়। রেসকোর্সে রেলিং-এর কাছাকাছি এসে দাঁড়ান—দেখবেন, এখনও সেই অষ্টাদশ শতকী উল্লাস। ওরা হয়ত কোন প্রিন্স অব

ওয়েলস-এর কেউ নয়—কিন্তু বড়দিন তাদের কথায় কথায়, হাতের ছোট্ট বইটির পাতায় পাতায়। এমন কি পার্ক স্ট্রীটের মরা কবরখানার গেটে দেবদারুর অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে গাড়িটি, ডিসেম্বরের ২৬ তারিখে নিজের অজান্তেই যদি কখনও পা বাড়ান সেদিকে, শুনবেন, বুড়ো কোচম্যান বিড়বিড় করছে—'হ্যাপি এক্সমাস সাহেব—আল্লা হুজুরকো জিন্দা রাখে!' নামতে নামতে হয়ত—ভাড়ার বাইরেও একটি সিকি বা আধুলি উঠে আসবে আপনার হাতে। হয়ত সতর্কতার সব প্রহরা এড়িয়ে, মাসকাবারী সব বাঁধন কেটে চলেও যাবে প্রসারিত ঐ শীর্ণ হাতটায়। দোষটা ইংরেজের নয়। সম্ভবত ডিসেম্বরের এই সন্ধ্যার, এই রহস্যময় কুয়াশার, এই উত্তুরে হাওয়ার; এবং মাথার উপরকার ঐ নীল চাঁদোয়ায় সাঁটা রাংতার তারাগুলোর—যারা জর্ডন আর গঙ্গা একাকার করে দেয়, বেথলহাম গলিতে নিয়ে আসে, কেরানীও সম্ভবত তাদের মায়াতেই বড়াসাহেব—সন্ধ্যা মাত্রকেই বড়দিন।

॥ রাত্রি দিন বহে যায় হার্মাদের ডরে ॥

—'মগদের রাজা কত করে মাইনে দেয় তোমাদের ? বন্দী ফিরিঙ্গী দস্যুদের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন শায়েস্তা খাঁ।

'—মাইনে ?' হো হো করে হেসে উঠল হার্মাদদের সর্দার। '—আওয়ার সেলারী ওয়াজ দি ইম্পিরিয়াল ডোমিনিয়ান নবাব !'

'—মানে ?'

—'মানে, তামাম বাংলাই ছিল আমাদের জায়গীর। বছরের বারোমাসই আমরা সানন্দে খাজনা আদায় করে বেড়াতাম সেখানে। তার জন্যে আমাদের কোন আমলা আমিন লাগত না। আদায় ওয়াশীল শেষ হয়ে গেলে কারও কাছে হিসেবেও দিতে হত না। আমরা ছিপ বেয়ে জল কেটে চলতাম—সেই ছিল আমাদের জরীপ—জরীপ একবার হয়ে গেলে আমরা প্রাপ্য আদায়ের কোনদিন কসুর করিনি নবাব !'—সগর্বে বলে চলল হার্মাদদের সর্দার,—'আমাদের রাজ্যে খাজনা কারও বকেয়া রাখার নিয়ম ছিল না। কোনদিন।—হ্যাঁ, হিসেবও তার থাকত বৈকি ! সে কাগজ ছিল আমাদের চোখ,—সেখানে লেখা থাকত কোন কোন গাঁ এখনও বাকী ! শুনলে অবাক হয়ে যাবে, গত চল্লিশ বছরে একদিনের জন্যেও আমরা সে হিসেব ভুলিনি !'

এই কথোপকথনটা হয়েছিল শয়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম বিজয়ের অব্যবহিত পরেই। অর্থাৎ, ১৬৫৫-৫৬ সনে। সেকালের বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরা জানেন—নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে জনৈক হার্মাদ সর্দার সেদিন যা শুনিয়েছিল, বাংলাদেশে, বিশেষ করে নিম্নবঙ্গের প্রতিটি গৃহস্থের বহুদিন আগে থেকেই তা মুখস্ত। ১৬১৫ সনে সন্দীপের পতনের দিন থেকে এদিকে পর্তুগীজের তখন এইমাত্র পরিচয় —ওরা হার্মাদ, জলদস্যু। বাংলার লোকগাথায়, কাব্যে প্রবাদে প্রবচনে

পর্তুগীজের সেদিন আর দ্বিতীয় কোন রূপ নেই, দ্বিতীয় কোন পরিচয় নেই। থাকবার কথাও নয়।

রোসাঙ্গ রাজসভার স্বনামধন্য কবি আলাওল,—বাড়ি ছিল যাঁর '…সদা সাধুলোক হর্ষ মনোরম, ভাগীরথী গঙ্গাধর বহে মধ্যে রাজ্যের প্রধান গ্রাম ফতেয়াবাদভূম'—নিজের কাজে যাচ্ছিলেন নদীপথে। হঠাৎ —বোম্বেটেদের আক্রমণ। সে আক্রমণে কবি পিতৃহারা হলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন: 'কার্যহেতু পন্থ ক্রমে আছে কর্মে লেখা দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥'

'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা যেমন একে 'কর্মের লেখা' বলে মেনে নিয়েছিলেন, সমসাময়িক নরনারীদের অনেকেই তাই। আরাকান রাজের হাতে বাদশাজাদা শাহসুজার মিত্রতা তথা পরবর্তী শত্রুতার করুণ কাহিনী আজ সর্বজ্ঞাত। কিন্তু যে রূপবতী কন্যাটিকে কেন্দ্র করে আরাকান রাজ সুধর্মের এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, সেই 'সুজাতনয়ার বিলাপের' নায়িকা পীরবানু নিজেও বোধহয় জানত না, যে-দুর্ভাগ্যের তরী তাঁদের মগের মুলুকে বয়ে এনেছে—সেটি এই হার্মাদদের। বন্দিনী মেয়েটি কাঁদত—'কি নাইয়র করালি বাপ ঠেইকলাম মঘ্যার হাতে!' বার্নিয়ার লিখেছেন এ কান্না ওঁদের কাঁদতে হত না যদি শাহসুজা ঢাকা থেকে পর্তুগীজদের জাহাজে চড়ে আরাকান যাত্রা না করতেন!

সবচেয়ে কম নির্ভরতা, সবচেয়ে কম নিরাপত্তা সেদিন বাংলার জলে, পর্তুগীজদের নৌ-বহরে। সেখানে তখন পল্টন আর হার্মাদদের পুরা-দস্তুর রাজত্ব।

'পল্টন' বলতে তখন বোঝাত অবিবাহিত ফিরিঙ্গী যুবক। অবশ্য সেদিক থেকে বলতে গেলে 'ফিরিঙ্গী' শব্দটারও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। কেননা, ফিরিঙ্গী বলতে একসময়ে ভারতে যে কোন ইউরোপীয়কেই বোঝাত।

এদেশে পর্তুগীজদের আদি নাম ছিল—দোভাষ। কেননা, অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের কাছে তখন তারাই ভারতে একমাত্র সহজলভ্য দোভাষী।

দোভাষ থেকে দোভাষী—তারপর টোপাস—টোপাসী। ফিরিঙ্গীকে, ইংরেজ, ডাচরা দোভাষ বলতেন যেমন তাঁরা দোভাষীর কাজ করতেন বলে, তেমন আমরা টোপাসী বলতাম তাঁদের মাথায় টুপি থাকত বলে। উল্লেখ-যোগ্য, ১৭৮০ সনে মিশন চার্চে প্রথম সারমন প্রচারিত হয়েছিল পর্তুগীজ ভাষায়! কারণ, এ দেশের লোক পর্তুগীজ ছাড়া তখন অন্য কোন বিদেশী ভাষা বোঝে না। ইংরেজ ক্লাইভ পর্যন্ত পর্তুগীজ ছাড়া তৃতীয় কোন ইউরোপীয় ভাষা জানেন না। ফলে—১৮২৮ সনে শ্রীরামপুরে ডাচরা যেমন তাদের সৈন্যবাহিনী চালাতেন পর্তুগীজ ভাষায়, তেমনি ১৮১১ সন পর্যন্ত কলকাতার চার্চে চার্চে একমাত্র ভাষা ছিল পর্তুগীজ!

সে যা হক, পর্তুগীজ পল্টনেরা নিজেদের ভাবত 'ফিডাল গো'—ইংরেজী তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায়—'নাইট'। তারা জানে না ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে সেই ঐতিহাসিক বীরধর্মের দিন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। শোনা যায় এদের এই বিলম্বিত ক্ষাত্রধর্ম দেখে হাসি চেপে না রাখতে পেরে ১৬০৫ সনে কার্ভেনটিস লিখেছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ—'ডন কুইকসোট'। তাঁর ব্যঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—ষোড়শ শতকের পর্তুগীজ অভিযাত্রীরা তথা পূর্বদরিয়ার কাপ্তান, হার্মাদ এবং পল্টনেরা!

পল্টনদের কর্তা বা দলপতি ছিলেন কাপ্তান। কাপ্তানদের সাধনা ছিল কোন মতে এইসব তরুণ হার্মাদপল্টনদের দলে রাখা। কারণ বোম্বেটে-গিরি করতে গেলে ওরাই তাদের একমাত্র সম্পদ। ফলে, পল্টনেরা ডাঙায় থাকলে তাদের জমিতেই যে থাকত শুধু তাই নয়, দলপতির সঙ্গে এক টেবিলে ভোজ পর্যন্ত খেত! তবুও যে তারা ভদ্রস্তরের গৃহস্থ পর্তুগীজ নয়—সে বোঝা যেত তাদের পোশাক দেখে। বিবাহিত পর্তুগীজরা যে জামা পরতেন—পর্তুগীজদের সামাজিক আইন অনুযায়ীই অবিবাহিত পল্টন হার্মাদদের তখন তা পরা নিষিদ্ধ।

তবুও বিলাসিতার অন্ত ছিল না। রঙীন কোর্তা কমিজ চাপিয়ে পল্টন যখন রাস্তা দিয়ে চলত তখন চাকরেরা তাদের মাথায় ছাতা ধরে পিছু পিছু ছুটত। থাকত সাধারণত তারা 'মেস'-করে যূথবদ্ধ হয়ে।

এক এক আস্তানায় জনাদশ বারো হার্মাদ। মাথাপিছু তাদের একখানা করে খাট, শিয়রে একটি করে টেবিল, বসবার জন্যে গোটা দুই টুল। সেই টুলে বসে স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বোম্বেটেগিরি করে বেড়িয়ে এসে যে ভোজ তারা খেত তার মেনুতে থাকত—পান্তা ভাত আর নোনা মাছ! আরও দুঃখের সমাচার, দলের কেউ দিনের বেলায় 'কাপ্তানী'তে বের হলে অন্যদের দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকতে হত। কেননা, পাঁচজনের মধ্যে বের হওয়া যায় এমন পোশাক এই আড্ডায় এক প্রস্থই আছে।

দুর্ধর্ষ লাতিন রক্ত তাতেই খুশী। কেননা অভাব থাকলেও অভিভাবকহীন এই দেশে আনন্দ আছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে ঘাটিতে ঘাটিতে, গঙ্গার মোহনার দ্বীপগুলোতে, চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, সন্দীপ নামক রাজ্যগুলোতে অফুরন্ত আনন্দ ছড়িয়ে আছে—হুগলী, শ্রীপুর, কত্রাভু, ভুলুয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত জীবন—'চল সেদিকে!'—ভয় কি? কোনদিন কোথাও না কোথাও কোন পাদ্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে, সেদিন 'স্বীকারোক্তি' করলেই হবে। উল্লেখযোগ্য, এই দুর্ধর্ষ মানুষগুলোও সেকালের অনেক ভক্ত খ্রীষ্টানের মতই বিশ্বাস করত—'কনফেশান' সর্বপাপহর!

সুতরাং বছরের অধিকাংশ সময়টাই ওরা কাটাত জলে জলে, বোম্বেটেগিরিতে। ক্রুর সর্পের মত যে নৌকাগুলোতে ওরা বাংলার নদী নালা চষে বেড়াত সেগুলোকে বলা হত—'গ্যালিয়ট'। সাধারণ দিশি লস্করেরাই তার নাবিকের কাজ করত। ডাকু পল্টন আর দিশি লস্কর ছাড়াও সে সব নৌকোয় মধ্যে মধ্যে এক আধজন পাদ্রীকেও দেখা যেত। কিন্তু খোলে উঁকি দিলে সব সময়ই যাদের দেখা যেত তারা—লুঠের মাল—গোলামেরা। হাতের চেটোয় ফুটো করে তার মধ্য দিয়ে বেত চালিয়ে ওরা এক এক ঝাঁকে পাঁচ সাতজনকে বেঁধে রাখত। মাঝে মাঝে পাটাতন ফাঁক করে ভেতরে ছিটিয়ে দেওয়া হত শুকনো চাল আর জল। কেননা, দূর দূর দেশের হাটে গিয়ে নোঙর করা পর্যন্ত মানুষগুলোকে

বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৈকি! কাপ্তান জানে মানুষ মেরে কাপ্তানী করা যায় বটে কিন্তু মরা গোলাম হাটে বিকোয় না!

'বদর' 'বদর' করে নৌকো তাই ছুটত কখনও আরাকানের পথে, কখনও পশ্চিমে আফ্রিকার দিকে। 'নসরমালুম' নামক পালাগানের পূর্ববঙ্গীয় কবির ভাষায় সেই চলমান নৌবহরের বর্ণনা :

> 'দূরে থাকি ডাকুর দল ছুরমি ধরি চায়।
> দেখিয়া নছর মালুম করে হায়রে হায়॥
> দশ বারজন আইলো তারা কালো জাঙ্গি পরি।
> কারো গায়ে লালকোর্তা মাথায় পাগড়ি॥
> কোমরেতে তলোয়ার হাতেতে বন্দুক।
> ছরদ হইয়া গেল নছরের বুক॥
> দাড়িমাল্লা ছিল যত ছুয়ানি টেগুল।
> হাত পা লাড়িয়ে তারার গায়ৎ নাইরে বল॥'

সপ্তদশ শতকে এই 'লালকোর্তার' হাতে কত নছর মালুমের বুক যে ছরদ হয়ে গেছে,—কত নছরের ধমনীতে যে বেপরোয়া পশ্চিমা রক্ত এসে মিশেছে, সে ইতিহাসের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখনও আমাদের সাহিত্যে—কবি কঙ্কনের 'চণ্ডীতে', রামগোপালের 'শাখা নির্ণয়ে', রূপরামের 'ধর্মমঙ্গলে', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় নানা করুণ কাহিনীতে, তাছাড়া, আমাদের কুলপঞ্জিকায়, ঘটকের ছড়ায় ('মগ দোষ') এবং প্রতিদিনের ভাষায় পর্যন্ত। প্রসঙ্গত আপাতত শুধু একটি শব্দেরই উল্লেখ করি। পূর্ববঙ্গে কেউ একটু বেশী তাড়াতাড়ি হাঁটলে লোকেরা এখনও বলে—'মগধাওনি'। এই শব্দটার জন্ম শায়েস্তা খাঁ-র সেই চট্টগ্রাম আক্রমণ কালে। ব্যতিব্যস্ত মগ আর হার্মাদ দস্যুদল সেদিন লুঠের ধন সব মাটির নীচে পুঁতে রেখে ছুটে পালিয়েছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার দিকে। সেই ধেয়ে পালানো থেকেই নিম্নবাংলায় জনপ্রিয় কৌতুক—'মগধাওনি'। সন্দেহ নেই, ১৬৬৫-৬৬ সনের দুর্দম হার্মাদদের এই পরাজয় এবং পলায়নকে বাংলাদেশের

সাধারণ মানুষ স্বস্তির সঙ্গে উপভোগ করেছিল সেদিন। কারণ, এদেশে তখন সত্যিই—'রাত্রি দিন বহে যায় হার্মাদের ডরে!'

শুধু বাংলায় নয়, এ দেশের মাটিতে পা দেওয়ার প্রথম দিন থেকেই ভারতের সাধারণ মানুষের চোখে ফিরিঙ্গী বণিকের একমাত্র পরিচয়—ওরা হার্মাদ। উল্লেখযোগ্য, যদিও 'হার্মাদ' শব্দটা এসেছে 'আর্মাডা' তথা নৌবহর থেকে তবুও ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভাস্কো ডা গামার চার জাহাজের বহরটি নোঙর করার বহু আগে খাস পর্তুগালরাজ যে 'হার্মাদ'-টিকে পাঠিয়েছেন আমাদের দেশে, সে এসেছিল অন্য বেশে। সুদূর ১৪৮৮ সনে জনৈক মুসলমানের বেশে সজ্জিত মালাবারে যে আগন্তুকটি পদার্পণ করেছিলেন সেদিন, তিনি মার্কোপোলো নন, ওডোরিক নন, মণ্টে কোর্ভিনো নন—নাম ছিল তাঁর, পিরো ড কোভিল হাম। আর পরিচয় পর্তুগীজ-দের নিজস্ব জবানী অনুযায়ী তিনি ছিলেন—লিঙ্গুইস্ট, সোলজার, স্পাই এণ্ড ডিপ্লোম্যাট! অর্থাৎ একাধারে যোদ্ধা, ভাষাবিদ, গুপ্তচর এবং কূটনীতিক!

বলাবাহুল্য, ১৪৯৮ সনের ২৭শে মে ভাস্কো ডা গামার আগমন দিন থেকে শতকের পর শতক ধরে পরবর্তীকালে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও কোভিল হামের যোগ্য উত্তর পুরুষ!

১৪৯৭ সনের ৮ই জুলাই টেগস নদীর মোহনায় বেলেম বন্দরের তটে দণ্ডায়মান ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতার ব্যঙ্গের উত্তরে (উল্লেখযোগ্য, এই অভিযানের পেছনে সেদিন পর্তুগালবাসীদের বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না।) ভাস্কো ডা গামা বলেছিলেন—'আমি যাচ্ছি মশলা আর খ্রীষ্টানের সন্ধানে।' কিন্তু আশ্চর্য, খৃষ্টের নামে ভাসমান সেই বাণিজ্য-তরীর পতাকা দণ্ডে সেদিন পতপত করে উড়ছিল যে নিশানটি তাতে ক্রুশের নীচেই ছিল কামান! মশলা, খৃষ্টান আর কামান—যদৃচ্ছ ব্যবসা, বেপরোয়া ধর্মান্তর, আর যুদ্ধের নামে বোম্বেটেগিরি—ভারতে সাড়ে চারশ' বছরের রাজত্বে এই ছিল পর্তুগীজের চিরকালের কর্মজীবন, সাম্রাজ্যদম্ভের ভেতরের-পকেটে একমাত্র মূলধন।

স্বয়ং ভাস্কো ডা গামার কথাই বলা যাক। ক'বছর আগে প্রথম পদার্পণের দিনে যে গামাকে পাল্কিতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা সহকারে রাজ সন্দর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন কালিকটের নাগরিকেরা, যে বিধর্মী বিদেশীকে চন্দন কুমকুমে স্বাগত জানিয়েছিলেন স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা, সেই গামাই ১৫০২ সনে কালিকটে যে বর্বরতা দেখিয়েছিলেন ইতিহাসের তামসতম যুগেও তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। আটশ' বন্দীর হাত পা নাক কান কেটে সেদিন তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন জামোরিনকে। শোনা যায়, তাঁর আদেশে মানুষের কানের জায়গায় সেদিন বিজয়ের প্রতীক হিসেবে যুক্ত হয়েছিল কুকুরের কান! (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হাণ্টারের মতে জামোরিন শব্দটি আসলে তামিল 'সামুরি'র বিকৃতি। সামুরি মানে রাজা। অন্য একজন ঐতিহাসিকের মতে 'কালিকট' শব্দটির মানে সেই শহরটি যা 'কুক্কুট'-রবের সীমানার অন্তবর্তী।)

খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের নামে ভারতে পর্তুগীজরা যা করেছেন নৃশংসতায় তাও তুলনারহিত।

মালাবার উপকূলে খৃষ্টের অব্যবহিত পরেই এসে পৌঁছেছিল যিশুর বার্তা। শোনা যায়, যিশু-শিষ্য স্বয়ং সেণ্ট টমাস এসেছিলেন এই সনাতন দেশে সেই বার্তা বহন করে। এবং শোনা যায়, তিনি দেহরক্ষা করেছেন এদেশেরই মাটিতে মাদ্রাজের মালিয়াপুরে। অনেক পশ্চিমী ঐতিহাসিক এবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন বটে, তবে পানিকরের মতে মালাবারে যে ১৮২ খৃষ্টাব্দে গীর্জা ছিল, সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। এছাড়া ৫২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি বইয়ে নাকি স্পষ্ট লেখা আছে: সেই ভারত যেখানে গোলমরিচ জন্মে সেখানেও একজন পাদ্রী আছে! অনেকের মতে মালাবারের সেই গীর্জার প্রতিষ্ঠাতা কনস্টানটিনোপল-এর পেট্রিয়ার্ক নেস্টোরিয়াস।

সে যাই হক, যে কোন কারণেই হক, ভাস্কো ডা গামার আগমন দিনে কালিকটে যে কমপক্ষে দুই লক্ষ খৃষ্টান ছিল সে বিষয়ে গামা নিজে অন্তত নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু ১৫১০ সনে আলবুকার্ক কর্তৃক গোয়া দখলের

পর ক্রুশ হাতে ভারতের মাটিতে পর্তুগীজরা যে ধর্মাচারের পরিচয় দিয়েছিল —তাতে তারা নিজেরাই যথার্থ খৃষ্টান কি না ভারতীয় খৃষ্টানদের মনে তাই নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল! কেননা সাচ্চা খৃষ্টান কিছুতেই সেসব নির্দেশ জারী করতে পারে না।

প্রথমত, ছুটো বন্দর হাতে আসা মাত্র আদেশ জারী হল—যারা খৃষ্টান নয় কোচিনে তাদের বাস করা চলবে না। দ্বিতীয়ত, ১৫১৭ সনে পাকাপোক্তভাবে গোয়ার চার্চের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র শুরু হল ব্যাপক হারে জবরদস্তি করে ধর্মান্তিকরণের কাজ। অথচ, ইবাদতখানায় বসে হিন্দুস্থানের মুসলিম বাদশা আকবর তখন দিনের পর দিন মনযোগ দিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন জেসুইট মিশনারীদের কাছে। ছুনিয়ার কোন্ ধর্মের সঙ্গে খৃষ্ট-ধর্মের কোথায় ফারাক তাই তিনি জানতে চান।

সেটা জানা গেল আরও কিছুদিন পরে, ১৫৪০ সনে—পর্তুগালরাজ তৃতীয় ডম জো'র লিখিত আদেশ অনুযায়ী যেদিন শুরু হল গোয়ায় মন্দির মসজেদ পোড়ানোর কাজ!

কুড়ি বছর পরে, ১৫৬০ সনে পর্তুগালের 'যিশু' আরও প্রবল হয়ে আবির্ভূত হলেন ভারতের মাটিতে। সে বছর গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল ধর্মীয় আদালত বা 'ইনকুইজেশন'। কত 'অবিশ্বাসী'কে সেখানে জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। যদি থাকত তাহলে বোধহয় দেখা যেত বিধর্মীকে হত্যার ব্যাপারে গোয়ার এই আদালতটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনের চেয়ে খুব পেছনে নেই। এবং তা ছিল না বলেই সম্ভবত সেদিন পর্তুগালের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় কবির মুখে সখেদে উচ্চারিত হয়েছিল এই জিজ্ঞাসাটি:

You who usurp the title of the messengers of God.—do you think you are following St. Thomas?

কিন্তু হায়, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত সেদিন কেউ ছিলেন না ভারতের পর্তুগাল সাম্রাজ্যে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ দর্শক ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন সেখান থেকে ফিরে এসে প্রকারান্তরে যা জানিয়ে-

ছিলেন তার মর্ম: এক লক্ষ ষাট হাজার খৃষ্টানের জন্যে গোয়ায় পাদ্রী আছে বটে তিরিশ হাজার, কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র দর্শনীয় মানুষ বোধহয় তিনিই যিনি একটি কাঠের বাক্সে শায়িত! অন্যান্য অনেক দর্শকের মতেই স্বনামধন্য খৃষ্টান ভক্ত সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সংরক্ষিত দেহটিই গোয়ার ধর্মজীবনে একমাত্র সম্পদ—মালাবার উপকূলে ইউরোপের একমাত্র স্মরণীয় ঐতিহ্য। ১৫৪২ সনে এই মহাত্মা যেদিন গোয়ায় অবতরণ করেছিলেন, পর্তুগাল রাজপুরুষেরা সেদিন মোটেই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, প্রতীক্ষিত ভক্তদের সম্পূর্ণ হতাশ করে জাহাজ থেকে তিনি ভারতের মাটিতে নেমে এসেছিলেন শতচ্ছিন্ন একটা জামা গায়ে, খালি পায়ে। তদুপরি, গভর্নর জেনারেলের পাল্কী চড়ে তাঁর প্রাসাদে না গিয়ে জাহাজ ঘাটা থেকে পায়দলে তিনি সোজা চলে গিয়েছিলেন জেস্যুইটদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় হাসপাতালে! সুতরাং সেণ্ট জেভিয়ার্স বা দক্ষিণে 'ব্রাহ্মণ পাদ্রী' নামে খ্যাত ডি নোবিলির কথা স্বতন্ত্র! এঁদের মত মানুষের স্মৃতি নিশ্চয় ভারতের কাছেও সম্পদ!

কিন্তু দুঃখের বিষয় পর্তুগালের জাহাজে জেভিয়ারের মত মানুষ এদেশে অনেক আসেন নি। যারা আসত তাদের মধ্যে কিছু কিছু বেপরোয়া স্বেচ্ছা সৈনিক ছিল বটে কিন্তু বাদবাকীদের অধিকাংশকেই সংগ্রহ করা হয় খাস পর্তুগালের হা-ভাতেদের ঘর থেকে। এমন কি নাগাল পেলে দশ বছরের বালককেও বাদ দিত না ওরা। তবে এশিয়ার সাম্রাজ্যশাসনে সব-চেয়ে দেশী লোক জুগিয়েছে যে বস্তুটি সে লিসবনের কয়েদখানা। ভারতে রাজপুরুষের অভাব ঘটেছে শুনলেই খুলে দেওয়া হত জেলখানার দরজা। এবং জাহাজ বোঝাই হয়ে এদেশে এসে নামত—চোর, গুণ্ডা, ডাকাত বদমাসের ঝাঁক—এক কথায় পরিচয় যাদের—হার্মাদ।

শুধু নাম শুনে হার্মাদের সঠিক পরিচয় বোঝা যাবে না। কেননা, শুধু বাংলার নদীনালায় দস্যুবৃত্তিই তাদের একমাত্র জীবন ছিল না। সে জীবনে বৈচিত্র্য ছিল, ছিল উজ্জ্বল আরও ক'টি কলঙ্ক রেখা।

প্রথম থেকেই শুধু সরকারী অনুমোদন নয়, পৃষ্ঠপোষকতা ছিল—ফলে

অনেক পাদ্রী সাক্ষী দিচ্ছেন ১৬০০ সনে রাশি রাশি ইউরেশিয়ান সাদায় কালোয় মেশা—এক নতুন শ্রেণীর নারীতে অপ্সরাপুরী হয়ে উঠেছিল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাদের হাস্যে লাস্যে বর্ণে ঢংয়েই সেদিনের গোয়া যেন—সোনালী, গোল্ডেন।—'গোল্ডেন গোয়া।'

না তাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের মত পুরোপুরি এদেশী, না উজ্জ্বল দেহবর্ণ সত্ত্বেও পুরোপুরি বিদেশী—এসব হতভাগ্য মেয়েদের তাই সাধনা ছিল কোন মতে কোন খাস ইউরোপীয়ানের কোটের কোণ ধরে সমাজে ইজ্জৎ রক্ষা করা! ফলে, বলা নিষ্প্রয়োজন সদ্যাগত হার্মাদ সেখানেই পেল প্রথম সুযোগ। তারা সানন্দে এই হাতছানিটা কাজে লাগাল।

শুনতে অবাক লাগলেও একথা ইতিহাসের সত্য যে সেদিন সেই সচ্ছল অনায়াস গার্হস্থ জীবনেও এদেশের পর্তুগীজদের একটা বিপুল অংশ সংসার চালাত এই সব মেয়েদের রোজগারের ওপর নির্ভর করে। ওলন্দাজ পর্যটক লিনসকোটেন লিখেছেন: গোয়ার পর্তুগীজ আর আধা পর্তুগীজ জোয়ান কখনও গায়ে খাটে না।

যে মেয়েটি তাকে আশ্রয় দিত সেই তার খাওয়া জোগাত, হাত খরচের পয়সা দিত। এ পয়সা আসত গৃহকর্তা তথা গৃহকর্ত্রীর অসংখ্য বাঁদীর হাত দিয়ে। গোলামেরা যখন ঘরদোর সাফা করে মাননীয় প্রভুর কুটীরকে প্রাসাদ বানিয়ে তুলত, বাঁদীরা তখন বসে বসে আচার মোরব্বা বানাত, সুচের কাজ করত। ওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী যারা, সন্ধ্যায় সেজে গুজে তারা পসরা নিয়ে রাস্তার বের হত। এবং ওলন্দাজ পর্যটক লিখেছেন—তারা সেদিনের গোয়ার পথে পথে শুধু হাতের ঐ ডালিটাই ফিরি করত না!

তবুও, এত হাতে রোজগার সত্ত্বেও গৃহকর্তায় মনে শান্তি ছিল না। কেননা; গৃহকর্ত্রী যিনি তিনি রমণী, কার্য-কারণে সেদিনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পর্তুগীজ মানুষগুলোর কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আর যা-ই হক, ইউরেশিয়ান রমণীকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কেননা, সারাদিন বাঁদী গোলামের সেবা যত্নে যিনি ফুলের মত কোমল এবং নির্মল—মামা-

দেশের ভ্রমণকারীরা সাক্ষী দিয়েছেন—রাত্রে বাঘিনী না হলেও সর্পিনী। একজন লিখেছেন—বাঁদী গোলামের মারফতে ওরা বাইরে প্রণয়ের বেসাতি করে। অন্য একজনের সাক্ষ্য : স্বামীকে ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে—ওরা সেই ঘরেই প্রণয়ীকে আপ্যায়ন করে। সে তথ্য তথাকথিত স্বামীটির কানে পেঁছান মাত্র তিনি যদি সরে না পড়েন তবে তার মৃত্যু অবধারিত। কেননা, প্রথমত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে পারে (তা অতিথি এবং অভ্যাগতের চেয়ারের উচ্চতায় তারতম্য ঘটলেও হত!), দ্বিতীয়ত—নিজের ঘরেই স্ত্রীর হাতে বিষপ্রয়োগ হতে পারে। এবং সে বিষ আর কিছু নয়, ভারতের ধুতরা বীজ। সেদিনের আধা পর্তুগীজ মেয়েরা নাকি তার রকমারি ব্যবহার জানত।

পুরুষেরা জানত শুধু লড়াই করতে, আর বাঁদী গোলাম সংগ্রহ করতে। সপ্তাহের প্রায় সাতদিনই গোয়ার হাটে গোলাম বাঁদী বিক্রি হত। দোকানীরা ক্রেতাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষগুলোর শরীরটা দেখাত, কার কি গুণাবলী—কে ভাল রান্না জানে, কে ভাল গীটার বাজায়, কে ভাল চুল বাঁধতে জানে তার বিবরণ দিত! পিরাড লিখেছেন :

'You can see there very pretty elegant girls and women from all countries in India!'

এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নানা গুণে গুণবতী! পরবর্তীকালে পর্তুগীজদের এই রূপের হাটে একবার এসেছিল এমন দু'জন মুসলমানী যারা ছিল—মমতাজ বেগমের খাস মহলের নর্তকী। দস্যুরা ওদের চুরি করে এনে জোর করে খৃষ্টান করেছিল। শুনে, বেগমের চোখের দিকে তাকিয়ে শাজাহান তার দাম আদায় করেছিলেন—চার হাজার ফিরিঙ্গীকে হত্যা করে।

ভবিষ্যতে স্ত্রীর নামে যিনি তাজমহল গড়বেন তাঁর পক্ষে এই প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ত তত বিস্ময়কর নয়, কিন্তু বিস্ময়কর—গরীব বাঙালী জেলেদের প্রতিরোধ কাহিনী। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র এক একটা টুকরো আজ বিশেষ করে আবার শোনাতে চাই এজন্যে যে, গোয়ার সাড়ে 'চারশ'

বছরের সাম্রাজ্য আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল যে ঝড়ের ফলে, তার কেন্দ্র বিন্দু গত ১৭ই নভেম্বর পর্তুগালের রাইফেলে গর্জিত প্রথম গুলীটি। সেটিও বর্ষিত হয়েছিল অঞ্জুদ্বীপের একটি গরীব ধীবরের বুক লক্ষ্য করেই! অঞ্জুদ্বীপের ধীবরেরা শুনলে গর্ববোধ করবেন বাংলা দেশের ধীবরেরা এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে রেখেছেন ১৯৬১ সনের ১৯ ডিসেম্বরের বহু আগে, কয়েক শ' বছর আগে। এবং সে লড়াই লড়েছিলেন তাঁরা এক অদ্ভুত উপায়ে! গ্রাম্য কবির ভাষায় সে যুদ্ধের বিবরণ :

"কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।
জাইল্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে দলে॥
কেহ লৈল পালর বাঁশ, কেহ লৈল পই।
কেহ কেহ উজাইল ধামা দাও লই॥
ডাঙ্গার শুরু হৈলরে সেই ধূ-ধূ বালুচরে।
কারো মাথা ফড়ি গেল গে, কেহ গেল মরে॥
হাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তাড়াতড়ি আইল লগই মরিচের গুড়া॥
মরিচের গুড়া যানি কি কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলা দিল॥
ভোম খাইয়া পড়ে ডাকাইত বালুর উপর...!"

চোখে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে হার্মাদ নিধনের কৌশল হয়ত আজকের ভারতের সপ্তদশ ডিভিশনের আধুনিক সৈন্যদের জানা নেই কিন্তু মাত্র আটটি প্রাণ খরচ করে যে ভাবে তারা সাড়ে চারশ' বছরের ঔদ্ধত্যকে আরব সাগরে ছুঁড়ে দিলেন সেই কৃতিত্বটাও নিশ্চয় সাবাস পাওয়ার মত। যাওয়ার দিনেও এই আটটি প্রাণের অন্তত চারটি পর্তুগীজরা নিয়ে গেছে যুদ্ধ করে নয়—সেই ঐতিহাসিক হার্মাদীর বলে। ঠিক যে ভাবে জামোরিন ঠকে ছিলেন। কালিকটে ভাস্কো ডা গামার মত অঞ্জুদ্বীপে ওদের দেখানো সাদা নিশানটাকে বিশ্বাস করেছিলেন ভারতীয় নাবিকেরা!

সে যা হক, ইতিহাসের রায় ঘোষিত হয়ে গেছে। ভারতের বুক থেকে চিরকালের মত মুছে গেছে 'হার্মাদের ভয়'। সুতরাং, আজ এই বিদায় দিনে সাড়ে চারশো বছরের একটানা অমাবস্যার রাজত্ব সত্ত্বেও অনিবার্যভাবেই চোখে পড়ছে, বিশেষ করে এই বিশিষ্ট মুহূর্তে জোনাকীর মত জ্বলজ্বল করছে সেণ্ট জেভিয়ার, নোবিলি, প্রমুখ মানুষের কথা। বাংলাদেশের যে কোন মানুষ জানেন—বাংলা ভাষার প্রথম বইটি ছাপা হয়েছিল লিসবনে, বাংলা ব্যাকরণের যে কোন পাঠক জানেন—আমাদের আজকের মুখের ভাষায় অগণিত শব্দের আসল ঠিকানা পর্তুগাল। কিন্তু অনেকে জানেন না, ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল এই পর্তুগীজরা। এবং সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই গোয়ায়। জানেন না—শুধু দেশীয় ভাষায় পুঁথি রচনার সূচনা নয়, ওঁদের কলমেই প্রথম লিখিত হয়েছিল ভারতীয় গাছপালার নাম, ওঁদের জাহাজেই আমাদের দেশে এসেছিল—আনারস, কাজুবাদাম, চীনাবাদাম, মাষকলাই, বিলিতি মুগ, পেঁপে, লঙ্কা, রাঙা আলু, নোনা আতা, কমলালেবু, পেয়ারা, —এমন কি বাগভেরেণ্ডা পর্যন্ত! যে হুঁকার নলে মুখ দিয়ে মোগলদের আয়েসী দরবার, আমাদের নিত্যকার ধূম্রবিলাস, তার তামাকুট এদেশে পরিচিত করেছে কারা জানেন?—সেও এই অজানা দুনিয়া মন্থনকারী হার্মাদেরা! সুতরাং যাওয়ার দিনে পিঠে বুট চিহ্নটার পাশে এ বাবদে এক-আধখানা 'সাবাস' তথা পাঞ্জার ছাপ অবশ্যই তাদের প্রাপ্য! তাতেও যদি সব শোধ হয়নি বলে 'য়ুনো'য় ছোটেন সালাজার, তবে বলব—হ্যাঁ, চাঁপাফুলটাও তোমরাই এনেছিলে বটে!

—কী এবার নিশ্চয় তামাম শোধ!

॥ গোয়ার সেই পবিত্র শবাধার ॥

ক্যান্টন থেকে গোয়া, গোয়া থেকে লিসবন—একটি জীবনের স্মৃতিকে নিয়ে যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক ইতিহাসে সে এক আশ্চর্য অনুরাগের গল্প।

পথের চারণ দেহরক্ষা করেছিলেন পথেই। স্বদেশ, স্বজাতি, পরিচিত পরিবেশ থেকে বহু দূরে—ক্যান্টনের মোহানায় সান-চুয়ান নামে জেলেদের একটি দ্বীপে। সন্তের শয্যাপার্শ্বে তখন সহযাত্রী জনৈক চৈনিক শিষ্য অ্যান্টনিও ছাড়া আর কেউ নেই। সে ১৫৫২ সনের ২রা ডিসেম্বরের (মতান্তরে ২৭শে নবেম্বর) কথা। দিল্লির সিংহাসনে তখনও বাদশাহ্ আকবরের অভিষেক হয়নি, এবং গোয়া 'গোল্ডেন গোয়া' নামে পশ্চিমে সুখ্যাত হয়ে উঠলেও কলকাতার পথে পার্কে তখনও যাজকদের মুখে খ্রীষ্টীয় সুসমাচার প্রচার শুরু হয়নি। কলকাতা তখনও সুতানটী অথবা গোবিন্দপুর মাত্র।

অসহায় অ্যান্টনিও কাঁদতে কাঁদতে আপন গুরুর শেষকৃত্য সমাধা করলেন। নির্জন সেই দ্বীপে তিনি তাঁর দেহটি কবরস্থ করলেন। কোন মতে মাটি চাপা দিয়ে রাখা ছাড়া তাঁর পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়। ভক্ত অ্যান্টনিওর মনে মনে ভয়—তিনি পিঠ ফেরানো মাত্র জন্তুরা এসে সেই কবরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মাংস লোলুপ শ্বাপদের দাঁত আর নখে একটি পরম পবিত্র দেহ মুহূর্তে শতচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনেক ভেবে অ্যান্টনিও স্থির করলেন মৃতদেহটির ওপর চুন ছড়িয়ে দিলে হয়ত সে পরিণতি ঠেকানো যাবে। অমোঘ রসায়ন নিঃশব্দে দেহটিকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। অ্যান্টনিও তাই করলেন। রাশি রাশি চুনে মৃতদেহটি ঢেকে দিয়ে তিনি নিজের পথ ধরলেন।

অদূরেই ম্যাকাও। কিন্তু ম্যাকওয়ে তখনও পর্তুগীজদের আসন পড়েনি। তারপর কাছাকাছি পর্তুগীজ কেল্লা এবং উপনিবেশ মালাক্কা। যথাসময় সেখানে খবর পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে এক অভিযাত্রীদল প্রেরিত হল ক্যাণ্টনের দিকে। হাজার হোক, পশ্চিমের মানুষ, খ্রীষ্টীয় সন্ত—তাঁকে যোগ্য সমারোহে সমাধিস্থ করা চাই।

ওঁরা এসে কবর খুললেন—পরের বছর ফেব্রুয়ারীর ১৭ তারিখে। কিন্তু একি দৃশ্য? —প্রায় তিন মাস পরেও সন্তের দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত। হয়ত অ্যাণ্টনিওর চুন-ই এই অলৌকিক ক্রিয়ার জন্যে দায়ী—কিন্তু ষোড়শ শতকের পৃথিবী! সুতরাং, দিকে দিকে রটে গেল—মিরাকেল!—মিরাকেল! মাটির কোল থেকে তুলে সন্তের মৃতদেহ শ্রদ্ধাভরে বয়ে নিয়ে আসা হল মালাক্কায়। সেখানে মূল্যবান শবাধারে রেখে মহাসমারোহে আবার কবরস্থ করা হল তাঁকে।

গোয়া শুধু ঐশ্বর্যপুরী নয়, খ্রীষ্টীয় পূর্ব পৃথিবীর আত্মিক রাজধানীও। সুতরাং এই অলৌকিক বার্তা সেখানে পৌঁছনমাত্র স্থানীয় ভাইসরয় মালাক্কায় আদেশ পাঠালেন—এ কফিন গোয়ার প্রাপ্য, আমরা তা ফেরত চাই।

১৫৫৪ সনের ১৪ই মার্চ। সাধকের শবাধার নিয়ে পর্তুগীজ তরী গোয়ার অদূরে মান্দোভি এসে পৌঁছল। পরদিন দু'টি যুদ্ধ জাহাজ, অসংখ্য দিশি নৌকো এবং নানা ধরনের আরও বারোটি জাহাজ শোভাযাত্রা করে শবাধারবাহী তরী 'সাণ্টা ক্রুজ'কে নিয়ে আসা হল রাইবন্দর থেকে পুরনো গোয়ায়। গোটা শহর সেদিন বন্দরে। বন্দর থেকে শবাধার এল সেণ্ট পল গীর্জায়। পিছনে পিছনে বিশাল জনতা। জনতার দাবি মেনে শবাধারের ঢাকনা তিন দিনের জন্য খুলে দেওয়া হল। আবার সেই—অভাবিত দৃশ্য! অবাক বিস্ময়ে ভক্তরা দেখলেন—সাধকের দেহ এখনও সম্পূর্ণ অবিকৃত; সেই শান্তি সমাহিত মুখ, সেই কালো দাড়ি, এমন কি ঠোঁটের কোণে সেই স্বর্গীয় হাসি। দর্শকদের মধ্যে ইসাবেল ডি ক্যারম নামে এক ভক্ত মহিলা ছিলেন। তিনি আর বাসনা সংবরণ করতে

পারলেন না। সন্তের পদ চুম্বন করতে গিয়ে তিনি পবিত্র স্মৃতি হিসেবে তাঁর পায়ের একটি আঙুল মুখে নিয়ে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলেন!

এমনি আরও নানা বিচিত্র ঘটনা। প্রতি বছর দিন কয়েকের জন্যে শবাধার সকলের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। সমগ্র গোয়া তখন সেণ্ট পলসের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রী হয়। রাজ্যের আয়তন অবশ্য বিশাল ভারতের তুলনায় সামান্য—দৈর্ঘ্যে ষাট মাইল, চওড়ায় ত্রিশ মাইল একটুকরো জমি মাত্র। কিন্তু এই কফিন মাহাত্ম্য শুধু সেখানেই আবদ্ধ নয়—শবাধারের নামে দূর-দূরান্তের নানা মানুষ তখন গোয়াযাত্রী। এ পবিত্র শব স্পর্শ করতে পারলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আরোগ্য হয়, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, খঞ্জ চলনশক্তি। স্বভাবতই বছরে কয়টি দিনের জন্য সেণ্ট পলসের দুয়ারে মানুষের সমুদ্র। তারই মধ্যে শতক সম্পূর্ণ হওয়ার আগে হঠাৎ একদিন শোনা গেল—স্বর্গীয় পুরুষের আরও একটি পায়ের অঙ্গুলি অপসৃত! সেটা ধর্মীয় রীতির কোন ব্যভিচার নয়। কেননা, ১৯১৪ সনে ভ্যাটিকান থেকে স্বয়ং পোপের নির্দেশ এল—সন্তের দক্ষিণ হাতটি চাই। সবাহু সে হাত প্রেরিত হল রোমে। পরের বছর ভ্যাটিকান থেকে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হল—তিনি যথার্থই সন্ত ছিলেন। তিনি—'সেণ্ট।'

বাহাত্তর বছর পরে ১৬২৪ সনে সেণ্ট পলস থেকে আবার শোভাযাত্রা সহকারে সেই শবাধার বয়ে নিয়ে আসা ছিল 'বম জেসাস' গীর্জায়। নব প্রতিষ্ঠিত সুসজ্জিত বেদীতে কারুকার্য খচিত শবাধার রক্ষিত হল। সেই অমূল্য শবাধার আজও সেখানেই রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে। গোয়ার ভাগ্যাকাশে কখনও সূর্যালোক উঁকি দিয়েছে, কখনও নেমে এসেছে বিপর্যয়ের কালো মেঘ। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সম্পর্কেও তৎকালে দেশীয় শাসক মহলে সকলের মনোভঙ্গী সমান ছিল না। কিন্তু সব পরিবর্তনই সশ্রদ্ধায় চিরকাল যে বস্তুটিকে এড়িয়ে গেছে সে 'বম জেসাস'-এর এই শবাধার। গোয়ার ইতিহাসে সর্বশেষ পরিবর্তন ১৯৬১ সনের ডিসেম্বরে দীর্ঘকালের পর্তুগীজ শাসনের অবসান। ঔপনিবেশিকতার পীড়ন

শেষে পরিবর্তনের ঢেউ আজ গোয়ার সর্বত্র—প্রতিটি নাগরিকের অন্তরে। কিন্তু তার মধ্যে এখনও স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেই—শবাধার। আগামী ২৪শে নবেম্বর আবার জনসাধারণের জন্যে ডালা খোলা হচ্ছে তার। এবং তেমনি শ্রদ্ধাভরে, তেমনি সমারোহ সহকারে।

এ পর্যন্ত অনেকবার এই শবাধার উন্মুক্ত করা হয়েছে। সেকালে যখনই কোন বিশেষ পর্যটক বা রাজপুরুষ গোয়ায় পা দিতেন, তখনই তাঁর অন্যতম কৃত্য হত 'বম-জেসাস'-এর সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি দর্শন। জনসাধারণের ভাগ্যে সে সুযোগ আসত, দীর্ঘ যতি দিয়ে, অনেক বছর পরে পরে। কেননা, ১৭৫৫ সনের ২রা এপ্রিল তারিখে লিসবন থেকে এক রাজকীয় ঘোষণায় বলে দেওয়া হয়, খাস লিসবনের অনুমতি ছাড়া কখনো কফিন জনতার সামনে যেন না খোলা হয়। ফলে ১৭৮২ সনের পরে, 'বম-জেসাস' অঙ্গনে ভীড় দেখা গেছে বিগত কয়েক শতকে মাত্র কয়েকবার, —১৭৮২, ১৮৫৯, ১৮৭৮, ১৮৯০, ১৯০০, ১৯১০, ১৯২২, ১৯৩১ এবং ১৯৪২ সনে। আমাদের স্বাধীনতার পরে মাত্র তিনবার এসেছে সে সুযোগ— ১৯৫২, ১৯৬০ এবং ১৯৬১। তাও সকলের জন্যে নয়। ১৯৫২ সনে দর্শক পর্তুগালের একজন মন্ত্রী, এবং পরের উপলক্ষ্য দুটিতে অধিকার ছিল একমাত্র নিমন্ত্রিতদেরই। জনসাধারণের প্রিয় সাধুর শবাধারটিও যেন সেকালের রাজকীয় সম্পত্তি।

অনেক রাজকীয় বাসনার কথা শোনা গেছে 'বম-জেসাস' গীর্জায় রক্ষিত এই শবাধারটিকে কেন্দ্র করে। ১৫৬০ সনে পর্তুগালের রানী মারিয়া সোফিয়া বলে পাঠালেন—আমি সন্তের টুপিটি চাই। সম্ভবত বিশ্বস্ত অ্যান্টনিও সেটি গোয়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। রানী তখন সন্তানসম্ভবা। সুতরাং বোঝা গেল—এ সময়ে তিনি শুভ ফলের কামনায় টুপিটি নিজে মাথায় পরতে চান। অথচ টুপিটি একশ' আটত্রিশ বছর ধরে ওঁর মাথায় আছে, মন সহসা সেটি সরাতে চায় না। তবুও রানীর বাসনা। গোয়া থেকে টুপি প্রেরিত হল—লিসবনে। রানীর মনোবাসনা পূর্ণ হল। টুপিও এবার প্রত্যাশিত মাহাত্ম্য দেখাল। প্রীত রানী কৃতজ্ঞতায়

চিহ্নস্বরূপ সন্তের জন্যে একখানা মূল্যবান আচ্ছাদন পাঠালেন,—তার ওপর নিজের হাতে সুতোয় লিখে দিলেন—SUO S XAVERIO MARIA SOPHIA REGINA PORTUGALIS'। সেই অঙ্গাভারণ আজও নাকি 'বম-জেসাস'-এর সেই শবাধারে।

মারিয়া সেফিয়ার সাফল্য সমাচার শুনে টাসকানির ডিউক বললেন—সন্তের বালিশখানা চাই। বদলি হিসেবে আমি কথা দিচ্ছি, বম-জেসাস-এ শবাধারের জন্যে আমি নতুন একটি সমাধি গড়িয়ে দেব। অনেকের ধারণা, ডিউক মৃত্যুর সময়ে বালিশটিতে নিজের মাথা রেখে মরতে চেয়ে ছিলেন, তাই তাঁর এত আকুতি। এবারও প্রার্থনা মঞ্জুর হল। বালিশ গোয়া ছেড়ে ইউরোপ যাত্রা করল, আর সেরা দরবারী শিল্পীরা যাত্রা করল গোয়ার উদ্দেশ্যে। 'বম-জেসাস'-এ শ্বেতপাথরে নতুন সমাধি রচিত হল। তার গায়ে সন্তের জীবনকাহিনী খোদাই করা। তার ওপরে স্থাপিত হল কারুকার্য খচিত নতুন শবাধার,—সেটী গড়তে রুপোই লেগেছিল নাকি হাজার পাউণ্ডের। সে শিল্পকীর্তি এখনও 'বম-জেসাস'-এ জ্বল জ্বল করে।

বার বার খোলা-খুলি,—যদৃচ্ছ নাড়াচাড়া ; শবাধারের ভেতরে শায়িত সে স্বর্গীয় দেহে স্বভাবতই আজ কালের স্পর্শ। ১৬৩০ সনে গাসেত্তি নামে একজন যাজক লেখে বলেছিলেন—মণিমুক্তায় সুশোভিত সন্তের মুখখানা, একটী হাত আর পা দু'খানাই মাত্র দেখা যায়,—অন্যথায় তাঁর অঙ্গে যাজকীয় পোশাক। গাসেত্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—মুখখানা এখনও তেমনি আছে, রঙটা শুধু ধুসর হয়ে গেছে এই যা। ১৬৭৫ সনে বিখ্যাত পর্যটক ফ্রেয়ার লিখছেন—মুখটি এখনও সম্পূর্ণ তাজা, এমনকি গালটি পর্যন্ত তেমনি লালচে। পরের শতকের প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বভাবতই অন্য রকম দেখেছেন। ১৭০০ সনে হ্যামিলটন লিখেছেন—এই শব আসলে লোক জড় করার জন্যে সাজিয়ে রাখা একটি মোমের পুতুল মাত্র (a pretty piece of Wax-work that served to gull the people of their money)। হ্যামিলটন পর্তুগীজ বিদ্বেষী ছিলেন। সুতরাং তাঁর কথা অপপ্রচার হিসেবে উড়িয়ে দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু

তাঁর পরেও যে নানাজন নানা সময়ে এই শব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেটা বোঝা যায় ১৮৫৯ সনে তদানীন্তন পর্তুগীজ ভাইসরয়ের এক আদেশ থেকে। তিনি চিকিৎসকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে আদেশ দিয়েছিলেন—শবাধারে রক্ষিত দেহটি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত রিপোর্ট চাই। যথা সময়ে তাঁরা অনুসন্ধান-ফলও প্রকাশ করেছিলেন। তার বক্তব্য: সন্তের দেহটি এখন আর উচ্চতায় পাঁচ ফুট নেই, শুকিয়ে তিনি সাড়ে চার ফুট হয়ে গেছেন। গালের রক্তিম আভাও আর নেই, একটা কালো আস্তরণ (a dark dry integument) তাঁর মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছে। তবে চুলগুলো ঠিক আছে। ওঁরা আরও জানালেন—হারিয়ে যাওয়া আঙুল, বিলিয়ে দেওয়া হাতের কাহিনীটাও মিথ্যা নয়। ওঁদের ধারণা—এ দেশের জল হাওয়ায় এখনও অবশেষ হিসেবে যা রয়ে গেছে সেটা চমকপ্রদ।

এ রিপোর্টের পরে সাত দিনের জন্যে আবার খুলে দেওয়া হল শবাধারের ঢাকনা। দর্শকদের জন্যে প্রণামী ধার্য করা হয়েছিল। তবুও ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন দু'লক্ষ। তারপর প্রতি প্রকাশ-দিনে একই ভিড়। সবচেয়ে বেশী ভিড় হয়েছিল নাকি ১৯২৩ সনে। সেবার লোক হয়েছিল তিন লক্ষ। তখনও দর্শকেরা ইচ্ছে করলে দেহটি স্পর্শ করতে পারতেন; কেউ কেউ হাতে পায়ে চুমু খেতেন। ১৯৫২ সন পর্যন্তও তাতে কারও আপত্তি ছিল না। তারপর তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে দেহটি একটি কাচের আধারে রেখে তারপর শবাধারে বন্ধ রাখা হচ্ছে। সুতরাং গত কয়েক বছরের মত ভক্ত দর্শকেরা এবারও কাচের মধ্য দিয়েই তাদের প্রিয় সন্তের মর অবশেষ দেখতে পাবেন। আগেকার দিনের মত সেই পুণ্য দেহ স্পর্শের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন।

সন্দেহ নেই, তবুও আগামী ২৪শে নভেম্বর দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী সমবেত হবেন পুরনো গোয়ার 'বম-জেসাস' গীর্জার অঙ্গনে। বিশেষ করে এবার যাত্রীরা যদি পুরনো রেকর্ড ভেঙে খান খান করে এই শবাধারের সামনে এসে ভীড় জমান তবে সেটা মোটেই বিস্ময়কর

ঘটনা হবে না। কেননা গোয়া এখন ভারতের অঙ্গ এবং এই শবাধারে যে খ্রীষ্টীয় সন্তের দেহাবশেষ রক্ষিত তিনি ভারতের কাছে সুপরিচিত খ্রীষ্টান সাধক পুণ্যশ্লোক—সেণ্ট জেভিয়ার। পানিক্করের ভাষায় বলতে গেলে—সেণ্ট টমাসের পরে যিনি সমগ্র এশিয়ার মহত্তম খ্রীষ্টান নায়ক—the greatest figure in Asia after St. Thomas the Apostle.

ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্মের সূচনা বলতে গেলে গোয়ায় পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠা লাভের বহু আগে। অনেকে বলেন, মালাবারে খ্রীষ্টীয় উপাসনার সূচনা করেছিলেন স্বয়ং সেণ্ট টমাস। সে ঘটনা সম্পর্কে এখনও হয়ত বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে অন্তত পক্ষে ১৮২ অব্দ থেকে দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। তারপর ইতিহাসের অন্য পথে ক্রমে ভাস্কো ডা গামা, গোয়া—পশ্চিমের উপনিবেশ। যুগের নিয়মে স্থির হয়েছিল 'সদ্য আবিষ্কৃত' এই পূর্ব জগৎকে খ্রীষ্টীয় আলোকে আলোকিত করার দায়িত্ব রাজন্যবর্গের। সেই মত সমগ্র এশিয়া দুই ভাগে ভাগ করা হল। এক ভাগের আত্মোন্নতির ভার পড়ল স্পেনের রাজদরবারের ওপর, ভারত সহ অন্য ভাগ হাতে পেল পর্তুগাল। তারপর শুরু হল ধর্মের নামে বিচিত্র ইতিহাস। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু এটুকু বললেই বোঝা যাবে ভারতের কান্নায় সেদিন পর্তুগালের শ্রেষ্ঠ কবি ক্যামোয়েনস পর্যন্ত সখেদে প্রশ্ন তুলেছিলেন—you, who usurp the title of messenger of God, do you think you are following St. Thomas? ১৫৪০ সনের কাছাকাছি সময়কার কথা। গোয়ার আকাশ জুড়ে তখন আগুন আর কান্না—কান্না আর আগুন।

তারই মধ্যে যাজকের বেশে ১৫৪২ সনে একদিন এসে নেমেছিলেন এই করুণাময় পুরুষ। তারপর গোয়া থেকে মালাক্কা, মালাক্কা থেকে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে চীন, জাপান—দশ বছর ধরে এশিয়ার পথে পথে খ্রীষ্টধর্মের নামে সে এক তুলনাহীন অভিযাত্রা।

১৫৪২ সনের ২রা ডিসেম্বর। গোয়াবাসীরা আগেই খবর পেয়েছিলেন —এবার এক তরুণ ধর্মনেতা নামছেন এসে এদেশের মাটিতে। তিনি একদা বড় ঘরের সন্তান ছিলেন। জন্ম তাঁর ১৫০৬ সনে স্পেনের নাভারায়। যৌবন কেটেছে তাঁর রাজোচিত বিলাসে—কখনও শিকারে, কখনও কখনও অন্যতর আমোদে, কখনও যুদ্ধে। কিন্তু সে জীবন তিনি ছেড়ে এসেছেন। ফ্রাঁসোয়া ডি জাস্যু ই জাভিয়ার প্যারিসে যাজকের সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি এখন একান্তভাবেই ধর্মশীল। গোয়ার কাছে তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য খবর—তিনি যে শুধু পর্তুগাল রাজ তৃতীয় জনের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আসছেন তাই নয়, স্বয়ং পোপ তৃতীয় পলও তাঁকে ধর্মীয় প্রধানের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। স্বভাবতই বন্দরে সেদিন যথোচিত সম্বর্ধনার জন্যে আড়ম্বর অনেক।

পালের জাহাজ 'সান টিয়াগো' বন্দরে ভিড়ল। বড় বড় রাজপুরুষ এবং যাজকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু এ কি? দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে যাজকের বেশে যিনি ধীরে ধীরে নেমে আসছেন— চেহারাটি তাঁর রাজকীয় বটে—চওড়া কপাল, কালো চোখ, মসৃণ কালো দাড়ি; কিন্তু গায়ে তাঁর শতচ্ছিন্ন পোশাক, মাথায় একটা সস্তা টুপি। তার চেয়েও লজ্জাকর ঘটনা—যাজকের পায়ে জুতো নেই।

পাল্কি তৈরী ছিল। কথা ছিল শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে আর্চবিশপের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু অভ্যর্থনাকারীদের হতাশ করে জেভিয়ার্স জানতে চাইলেন—হাসপাতাল কোন দিকে, তারপর পায়ে হেঁটে সেদিকেই এগিয়ে চললেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি কুষ্ঠরোগীদের সেবায় লেগে গেলেন।......

পরবর্তী দশ বছর ধরে জেভিয়ার্স প্রতিদিন একই বিস্ময়কর যাজক।

॥ মহেঞ্জোদরোর জীবনের শেষ দিনটি ॥

হয়ত সেদিন সিন্ধু—নদী নয়, সমুদ্র। ঘুমন্ত শহর হঠাৎ জেগে উঠে সভয়ে দেখেছিল—পথে পথে জল। জল ঘরেও। হয়ত কোন শক্র বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। হয়ত বা অবহেলায় জীর্ণ প্রতিরোধ নিজেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। একতলা ছাপিয়ে জল ক্রমে দোতলার দিকে এগিয়ে আসছে। পালাবার পথ ছিল না। অসহায় শহর নিঃশব্দে পাতালে তলিয়ে গিয়েছিল। হয়ত বন্যা নয়, রাতের মহেঞ্জোদরোকে কাঁপিয়ে সেদিন হঠাৎ শুরু হয়েছিল ভূমিকম্প—কাঁপতে কাঁপতে ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছিল হাজার হাজার বছরের সাজানো শহর। হয়ত বা শত্রু এসেছিল। মশালের উজ্জ্বল আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তাদের হাতের কুঠার, তলোয়ার। সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে সেদিন আগুন আর আগুন। হয়ত সে আগুন শত্রুর লালসায় প্রজ্বলিত নয়, কোন অসতর্ক কুলবধূর হাতের প্রদীপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মাত্র। কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। আটলানটিস নাকি হঠাৎ তলিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রে, পম্পাই ভিসুভিয়াসের লাভা আর ভস্মের তলায়—নালন্দা নাকি পুড়েছিল প্রদীপের আগুনে। শহর অনেকভাবেই মরে—জলে ডুবে, জলের অভাবে—ক্ষুধার যন্ত্রণায়, বিলাসের প্রাচুর্যে—শত্রুর আক্রমণে, নিজেদের অমনোযোগে। প্রাচীন ব্যবলিন থেকে হালের হিরোসিমা—নমুনা তার অনেক। কিন্তু কী হয়ে মরেছিল মহেঞ্জোদরো? কার ভুলে? অথবা সে কি তবে অন্য কোন কাহিনী? যদি তা-ই হয়, তবে কী সেই অমোঘ নিয়তি, কোন বেশে সে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন এই প্রাচীন শহরের দুয়ারে?

পুরানো প্রশ্ন। গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পণ্ডিতেরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা কয়েকটি সম্ভাব্য

কারণ মাত্র—সুনির্দিষ্ট: কোন ডেথ-সার্টিফিকেট এখনও কেউ লিখতে পারেননি। হয়ত কোনদিনই তা হাতে পাওয়া যাবে না। কেননা, শেষ মৃত্যুর প্রায় চার হাজার বছর পরে মহেঞ্জোদরো আজ আবার মৃত্যু-শয্যায়। তার ভাঙা পাঁজরে নোনা ধরেছে। অবশেষ হয়ে এতকাল যা ছিল তাও আজ ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে। হালের খবর, সম্ভবত মহেঞ্জোদরো এবার বাঁচবে। কিন্তু প্রাণহীন শহর সেদিনও হয়ত আজকের মত মৌনই থাকবে। পূর্বজন্মের মৃত্যুর কাহিনীর জন্য তখনও আমাদের তার মাটির তলাই হাতড়ে ফিরতে হবে—এখানে ওখানে ভাঙা কোন মাটির পাত্রে, ছেঁড়া পুঁতির মালায় কিংবা কোন কঙ্কালের বুকে কান পাততে হবে। মহোঞ্জোদরোর মৃত্যুর আভাস একমাত্র ওরাই দিতে পারে।

ইতিমধ্যে তা দিয়েছেও। সে জবানবন্দী শোনার আগে সিন্ধু তীরের এই আশ্চর্য জনপদটির জন্মকাহিনীও একটু শোনা দরকার। বলা নিষ্প্রয়োজন, মহেঞ্জোদরোর মৃত্যু কাহিনী যেমন হাজার বছর আগেকার স্মৃতিমন্থন, জন্ম-কাহিনীও অনেকটা তাই। কবে, কারা—সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল, কী ছিল তাদের জীবন, সমাজ—সেসব এখনও হারানো-ইতিহাস। আমাদের মহেঞ্জোদরোর জন্ম-বৃত্তান্ত অতএব পরজন্মের কাহিনীমাত্র। সিন্ধু-তীরের এই শহর তখন নিজের নাম হারিয়ে নাম নিয়েছে—মহেঞ্জোদরো : সিন্ধুর ভাষায় তার অর্থ—'দি প্লেস অব দি ডেড'—মৃতের শহর।

হাজার হাজার বছর ধরে মৃতের-শহর ক'টি মরা ঢিবি হয়েই পড়েছিল। করাচী থেকে মাত্র তিন'শ মাইল দূরে চারপাশের ধূসর জমিতে ক'টি লাল রংয়ের স্তূপ। ইটের স্তূপ—পুরানো ইটের মতই লালচে রঙ তাদের। লোকেরা দেখে। মনে মনে ভাবে নিশ্চয় এক সময় এখানে কোন জনপদ ছিল। তার বেশি কেউ জানে না, ভাবেও না। ১৮৬৫ সালের কথা। তখন রেলপথ বসানো হচ্ছে করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত। কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন দুই ভাই,—জন আর উইলিয়াম বার্নটন। জন-এর দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা, উইলিয়াম-উত্তর দিকে। কাজ হয়ে গেল। অবসর

নেওয়ার পর জন তাঁর নাতি-নাতনীদের জন্য নিজের স্মৃতি-কথা লিখে-ছিলেন একটা। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : লাইন বসানোর কাজ তো নিয়েছি। কিন্তু মনে আমার দুশ্চিন্তা, রেলের পথ তৈয়ারির জন্য পাথর পাই কোথায়? স্থানীয় লোকেরা জানাল, কাছেই ব্রাহ্মণাবাদ নামে একটি পুরানো পরিত্যক্ত শহর রয়েছে, সেখানে রাশি রাশি ইট।…ব্রাহ্মণা-বাদ লুঠ হয়ে গেল। অর্থাৎ একটি প্রাচীন শহরের স্মৃতি চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল। ওদিকে পাঞ্জাব মূলতান লাইনেও তাই হল। সেখানে রেলের ইট জোগাল হরপ্পা। আজও সেখানে রেল চলে যে পথে তার নীচে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ইট—সাম্রাজ্যের কঙ্কালেই তৈয়ারি হয়েছে একালের জনপথ।

হয়ত মহেঞ্জোদরোর ইটগুলোও এমনই কোন কাজে লাগত। কিন্তু জন আর তার ভাই উইলিয়াম—ভারতে একমাত্র ইংরাজ ছিলেন না। করাচীতে থাকা কালে জন-এর সঙ্গে আর একজন ইংরাজের পরিচয় হয়েছিল। নাম তাঁর—কানিংহাম। ১৮৫৬ সনে তিনি একবার হরপ্পা বেড়াতে এসেছিলেন। ফেরার পথে লুঠের মাল থেকে কয়েকখানা শীলমোহরও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কানিংহাম সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। ১৮৬১ সনে অবসর নেওয়ার পর তিনি উত্তর ভারতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তা নিযুক্ত হলেন। তাঁর হাতের স্পর্শে হরপ্পা হাজার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে এবার কৌতূহলী জগতের সামনে উঠে বসার জন্য পাশ ফিরল।

তারপর ধীরে ধীরে আরও নানা আকারের নানা হারানো-জনপদ : মহেঞ্জোদরো, চান্দুদারো, জানগড়, জুকার, আমরি, রূপার, আলিমুরাদ, নাল ইত্যাদি। কানিংহাম থেকে মার্শাল, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, এন জে মজুমদার, ম্যাকে হুইলার। সিন্ধু-উপত্যকায় খোঁজাখুঁজি এখনও চলেছে। মহেঞ্জোদরো আলোয় এসেছিল ১৯২২ সনে। বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করলেন—মৃতের শহর—মহেঞ্জোদরো। আবিষ্কর্তা—রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। এই এলাকার সব কর্মকাণ্ডের সুচনা সেই রেললাইন। খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল সেই হরপ্পার মতই

ইট এখানে—সেই এক ধরনেরই ঘরবাড়িও যেন। হরপ্পা ইরাবতীর বাঁ তীরে, মহেঞ্জোদরো সিন্ধুর দক্ষিণ কূলে। দুই শহরে দূরত্বও কম নয়। হরপ্পা থেকে মহেঞ্জোদরো প্রায় চার'শ মাইল দক্ষিণে। তবুও সন্দেহ রইল না। মহেঞ্জোদরো আর হরপ্পা—একই সভ্যতা। আশপাশে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে আরও যে সব প্রাণহীন জনপদ তারাও সবাই কাছাকাছি স্তরের মানুষের কীর্তি। তারা কারা, কিংবা কী তাদের যথার্থ পরিচয় সে যেমন একটি জিজ্ঞাস্য তেমনই মুখে মুখে প্রশ্ন: কী করে হারিয়ে গেল এই শহর?

আঁভাইশো একর জুড়ে বিস্ময়কর শহর। কালের মাপে বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। কিন্তু দর্শকের মনে হবে যেন একালেরই কোন পরিত্যক্ত দিকে দরজা ছাড়া বাড়িতে ঢুকবার শহর। নাগরিকেরা কোন একদিন সেই যে সাত সকালে বেরিয়ে গেছে আর ফেরেনি। রীতিমত আধুনিক ধরনের পথঘাট, আধুনিক ঘরবাড়ি; অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবনার মত বিচক্ষণ টাউন-প্ল্যানিং। গরম দেশ। স্বভাবতই রাস্তাগুলো সরু। রাস্তার অন্য কোন পথ নেই। জানলা ছিল কিনা বোঝা যায় না। থাকলেও নিশ্চয়ই দেওয়ালের মাথার দিকে ছিল। এখন নেই। আলো-হাওয়া আসে ভেতরে খোলা উঠোনের পথে। উঠোন ঘিরেই বাড়ি, —সারি সারি ঘর। সেখানেই একদা বাস করতেন এই শহরের ব্যবসায়ী গৃহস্থ। শূন্য ঘরে আজ কেউ নেই—শুধু থমথমে অন্ধকার। কৌতূহল এই ঘরগুলো ঘিরেও কম নয়। কেননা, এগুলো তৈয়ারি হয়েছে পোড়া ইটে। লাল-কাদা আর মাটি মিশিয়ে তৈয়ারি ইটে। গাঁথুনি হিসেবে সিমেন্টের বদলে এমন জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে যা হাজার হাজার বছর পরে যথেষ্ট বলবান। একাধিক তল বিশিষ্ট বাড়িরও অভাব ছিল না মহেঞ্জোদরোতে। আজও তার আভাস পাওয়া যায়।

শহরের কেন্দ্রে ভিড় বেশি। ব্যবসা এবং বসবাস দুই-ই চলত সেখানে। স্বভাবতই রাস্তাগুলো খুব সরু। কিন্তু শহরের প্রাণকেন্দ্র ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে পা দিলেই দেখা যাবে চওড়া চওড়া রাস্তা।

এত চওড়া যে অনায়াসেই তা দিয়ে মোটর চলাচল করতে পারে। হাওয়া বা বৃষ্টির ধারা যাতে রাস্তা ধুয়ে না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সতর্কতার অভাব ছিল না। খোয়া কেটে মাটি পিটিয়ে এমন করে তৈয়ারি হয়েছিল মহেঞ্জোদরোর পথ যা একালেও অনেক দেশের ধারণার বাইরে।

জল আর জঞ্জাল সমস্যার মীমাংসা পদ্ধতিও ছিল চমৎকার। সেকালে তো বটেই, পুবের পৃথিবীতে একালেও এমন বিস্তারিত ব্যবস্থা অনেক শহরেই অনুপস্থিত। প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে ইট গড়া স্থায়ী ডাস্টবিন ছিল। হয়ত নগরসভার লোকেরা এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যেত। তরল ক্লেদ, ব্যবহৃত জলের জন্য ছিল ভূগর্ভস্থ নর্দমা। প্রত্যেকটি বাড়ির নর্দমার সঙ্গে যোগ ছিল সেগুলোর। পরিষ্কার করবার জন্য ছিল, ইটে তৈয়ারি ঢাকনাওয়ালা বড় বড় কুয়ো বা ম্যানহোল। সব শেষে শহরের দূষিত জলের দায়িত্ব নিত—'সোক-পিট'। যেন আজকেরই কোন আধুনিক শহর। জল সরবরাহের জন্য ছিল সুপরিকল্পিত নালা। নদী থেকে নালা কেটে জল নিয়ে এসে বাড়িতে বাড়িতে কুয়োয় সরবরাহ করা হত। সব বাড়িতে কুয়ো ছিল না। একমাত্র বিত্তবানেরাই ঘরে বসে জল পেতেন। গরীবেরা বাইরের কুয়ো থেকে জল নিয়ে আসত। একটি কুয়োর পাশে রাশি রাশি হালকা ভাঙা ভাঁড় পাওয়া গেছে। দেখলে মনে হয় দিনের পর দিন একদল মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে জল খেয়ে গেছে। একালের সাধারণ ভারতীয়ের মতই তাদের অভ্যাস।—এক পাত্রে দু'বার জল খায় না কেউ।

সাধারণের জন্য মহেঞ্জোদরোর আর একটি বিশেষ ব্যবস্থা—তার স্নানাগার। শহরের এক পাশে তিরিশ ফুট উঁচু একটি ভিত। লম্বায় সেটি চার'শ গজ, চওড়ায় তিন'শ গজ। জায়গাটা চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। হরপ্পায়ও এমনই একটি স্বতন্ত্র এলাকা রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন দুর্গ-দেওয়াল। নীচে, এই দেওয়ালের বাইরেই আসল শহর—দোকানপাট, বাড়িঘর। উঁচু ভিতটিতে কয়েকটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সেগুলোর কোনটাই বসতবাড়ি নয়। তার একটি—সাধারণ শস্যাগার, অনুমান করা হয় অন্যগুলোর একটি ছিল কলেজ বা এক[illegible]

[illegible]ল, অন্যটি মন্দির বা অন্য কিছু। তবে যে স্মৃতিচিহ্নটিকে সহজেই [illegible] যায় সেটি একটি 'পাবলিক বাথ' বা পুকুর। পুকুরটি লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় চব্বিশ ফুট। আট ফুট গভীর এই জলাধার আগাগোড়া ভাল করে ইটে বাঁধান। স্নানের পর তার জল পাল্টাবার ব্যবস্থা ছিল। দিনের শেষে অনেকে একসঙ্গে মিলে সেখান স্নান করত। পুকুরের তিনদিক ঘিরে ছোট ছোট ঘর। স্নানের শেষে ওখানে কি ওরা কাপড় ছাড়ত ?

এসব বিধিব্যবস্থা থেকে সহজেই বোঝা যায় নামহীন এই শহরে যারা বাস করত জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা ছিল বাস্তবপন্থী; যতখানি পায়া যায় জীবনকে ভালবেসে ভোগ করাই ছিল তাদের বাসনা। মহেঞ্জোদরোর অন্য আয়োজনেও তার ইঙ্গিত ছিল। এই শহরের লোকেরা শুধু যে চাকা ঘুরিয়ে রকমারি মাটির বাসন তৈয়ারি করতে জানত তাই নয়, লোহা তাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও তারা সোনা থেকে শুরু করে রূপো, ব্রোঞ্জ, তামা ইত্যাদি নানা ধাতুর ব্যবহার জানত। ব্রোঞ্জ-এর নর্তকী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে একখানা। তার হাত থেকে কাঁধ অবধি গহনা! হরপ্পায় একটি মেয়ের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। তার হাতে সোনার বালা—মুখে চারটি দাঁত রয়েছে এখনও, চতুর্থ দাঁতটি সোনার তার দিয়ে বাঁধা!

এই নগরের পরিচয়হীন নাগরিকেরা গম আর বার্লি ছাড়াও অন্য শস্যের ব্যবহার জানত। তারা তুলো থেকে সুতো এবং সুতো থেকে কাপড় বুনতে পারত। প্রায় সব ধরনের গৃহপালিত পশু ছিল তাদের ঘরে —গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুকর—হাতি, ঘোড়া, উট—কুকুর, বেড়াল, —সব। চান্দুদরোতে একটি ইটে দুটি প্রাণীর থাবার ছাপ পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন—একটি তার বেড়ালের অন্যটি কুকুরের। খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে কোন এক কুকুর একটি বিড়ালকে তাড়া করেছিল। প্রাণভয়ে বেড়াল যার ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল সেটি একটি সদ্য তৈয়ারি কাঁচা ইট। মহাকালের চোখে ধূলো দিয়ে সেই অতি তুচ্ছ নাটকীয় ঘটনাটির সাক্ষী হয়ে ইটটি আজও অক্ষত রয়ে গিয়েছে।

যানবাহনের মধ্যে গরুর গাড়ি, নৌকো ঘোড়া। মহেঞ্জোদরোর কোন নৌকার অবশেষে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মাটির পাত্রে এবং অন্যত্র তার চিত্ররূপ পাওয়া গেছে; গরুর গাড়ির প্রমাণ হিসেবে পাওয়া গেছে মাটির খেলনা গাড়ি। আজকের গরুর গাড়ির সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। আর একটি গাড়ির আভাস পাওয়া গেছে যার ওপর আচ্ছাদন ছিল—অনেকটা আজকের টাঙ্গার মত।

শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য খেলনা ছিল, সুন্দরীর অঙ্গাভরণের জন্য ছিল দূর দূরান্ত থেকে কুড়িয়ে আনা দামী, কম-দামী পাথর—রকমারি গহনা। নগরে নর্তকী ছিল। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছিল হাতি-ঘোড়া, উট, নৌকো, টোপর দেওয়া গাড়ি। মহেঞ্জোদরোও কি তবে আর এক রোম?

বিশেষজ্ঞদের চেষ্টার ফলে আজ মহেঞ্জোদরোর সামাজিক চেহারার মোটামুটি খসড়া আঁকা যেতে পারে। এদিকে মাকরাণ উপকূল থেকে কাথিয়াড়বার—ওদিকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ—সিন্ধু উপত্যকায় এই সভ্যতার ভূগোল আকারে মোটামুটি একটি ত্রিভুজ। একটি বাহু তার সাড়ে ন'শ মাইল, দ্বিতীয়টি—সাত'শ, তৃতীয়টি—সাড়ে পাঁচ'শ মাইল। এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংখ্য মৃত শহর, জনপদ। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় দুটির একটি মহেঞ্জোদরো, অ-টি হরপ্পা। বিশেষজ্ঞরা বলেন—দুই শহর আসলে এক সাম্রাজ্যেরই দুই রাজধানী। মহেঞ্জোদরোর কাছাকাছি আরও সতেরটি ছোট ছোট লুপ্ত জনপদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, হরপ্পার কাছে পাওয়া গিয়েছে ষোলটি। এগুলোও সেই বিস্মৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, সর্বত্র মোটামুটি এক ধরনের মাটির বাসন, এক ধরনের ঘরবাড়ি, শীলমোহর, ওজনের মান। পণ্ডিতদের ধারণা, কোন সবল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

নামহীন সেই রাজা তথা রাজাপুরোহিত রাজ্য শাসন করতেন মহেঞ্জোদরো এবং দ্বিতীয় রাজধানী হরপ্পা থেকে। জলপথের অভাব নেই। স্থলপথে চলতে পারে এমন বাহনও আছে। কৃষির ভিতে গড়ে-ওঠা

মহেঞ্জোদরো তাই তার চরম উন্নতির ক্ষণে এক সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র। সোনা, রূপা, তামা টিন—কোনটি এসেছে রাজপুতানা থেকে, কোনটি বেলুচিস্থান থেকে, কোনটি বা বোম্বাই, ব্রহ্ম—এমন কি ওমান থেকে। মহেঞ্জোদরোয় এমন পাথরও পাওয়া গেছে যা একমাত্র তিব্বতেই লভ্য !

বিত্ত যেমন ছিল, তেমনই ছিল শ্রেণীভেদ। শহরে বিত্তবান আর গরীবের বাড়িগুলো এখনও সহজেই আলাদা করা যায়। নগরের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল শাসন-কর্তৃপক্ষের। সে জন্য শস্যাগার ছিল। গম ভাঙার উন্নত কোন ব্যবস্থা ছিল। ভারতের অনেক অঞ্চলের গ্রাম-বাসীদের মতই মাটিতে গর্ত করে সেখানে গম ভাঙা হত। তবে পার্থক্য এই, মহেঞ্জোদরোতে এই কাজের জন্য বিশেষ শ্রমিকবাহিনী ছিল। তাদের বাসের জন্য শহরের একদিকে সারি সারি কোয়ার্টারস ছিল। একালের শ্রমিক বস্তীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য তাদের। নিচু জমি, ছোট ছোট খুপরির মত ঘর। তবে রাজার ঘরে যে ধন, টুনটুনির ঘরে সে ধন ছিল না এমন কথা কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। হরপ্পার এমনই এক শ্রমিক কুঠুরিতে সাত আট ফুট মাটির নীচে এক গাদা গহনা এবং দামী পাথর পাওয়া গেছে। খ্রীস্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে নিশ্চয় কোন গরীব তা চুরি করে এনেছিল। বেচরা তা আর ভোগ করে যেতে পারেনি।

হরপ্পায় এই বস্তীগুলো দেখে হুইলার মন্তব্য করেছেন—'মার্শালড লাইক এ মিলিটারি ক্যানটনমেণ্ট, অ্যাণ্ড বিস্পিকস অথরিটি।'—যেন সৈন্যদের ছাউনি, বাড়িগুলো প্রভুত্বের কথাই বলে! এক দল শ্রমিক গম ভাঙত, অন্যদল ধাতুর কাজ করত। মাটির বাসনপত্র, ইট—সবই সরকারী পরিচালনায় তৈয়ারি হত। পিগট লিখেছেন—ইট ইজ ইনএভিটেবল দ্যাট ওয়ান শুড মেনশান স্লেভ-লেবার হোয়েন ডেসক্রাইবিং দিস পিস অব প্ল্যানড ইকনমি!' অর্থাৎ এজাতীয় সুপরিকল্পিত অর্থনীতিতে দাস-শ্রমিক অনিবার্য। তাহলেও এমন কথা বলা চলে না যে মহেঞ্জোদরোতে দাসরাই সর্বস্ব ছিল। কেননা শহরে বিত্তবানদের বাড়ি ঘর যেমন সংখ্যায়

অনেক, তেমনই সাধারণ গৃহস্থ বাড়িও কম নয়। অনুপাত দেখে মনে হয়—মহেঞ্জোদরোতে মধ্যবিত্ত ছিল অন্যতম সম্প্রদায়।

তবে সব চেয়ে বিস্ময়কর বোধহয়—এই শহরের নাগরিকদের ঐতিহ্যবোধ, তথ্য পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছা। শতকের পর শতক চলে গেছে। সিন্ধুর বন্যা চাপা দিয়ে গেছে সাজানো শহর। ফিরে এসে আবার ঘর বাড়ি তৈয়ারি করেছে মানুষ একবার নয়—একাধিকবার। মহেঞ্জোদরোতে একই জমিতে পর পর নয়টি শহরের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এখনও আদিম মাটি স্পর্শ করতে পারেনি অনুসন্ধানীদের গাঁইতি। হরপ্পায় পাওয়া গিয়েছে ছয়টি শহর। কিন্তু আশ্চর্য এই—সব শহরই তার অব্যবহিত নীচেরটির নক্সা ধরে গড়ে তোলা। সেই একই রাস্তা—একই ঘরবাড়ি। নতুন করে গড়তে গিয়ে পুরানো রাস্তার ওপর বাড়ি তুলে ফেলেনি কেউ। পরিবর্তনের প্রতি এই অনীহা অন্যত্রও। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু নীচের শহরে যে লিপি, যে সব অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, ওপরেও তাই! তবে কি মহেঞ্জোদরো বদ্ধ-জলার মতই প্রাকৃতিক পরিণতি মেনে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছিল?

সন্দেহ নেই, মহেঞ্জোদরোর মৃত্যুর পিছনে সেটাও একটা কারণ। হাজার হাজার বছরের অনড় সামাজিক এবং আর্থিক ভিত ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছিল। প্রমাণ তার অনেক। অন্যতম প্রমাণ, শেষ পর্যায়ে তৈয়ারি ঘরবাড়িগুলো—বিশেষজ্ঞরা বলেন—প্রথম দিককার বাড়িঘরের তুলনায় যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্বল। যেন কোন মতে কাজ সারা—অমনোযোগের লক্ষণ সুস্পষ্ট। হয়ত সেই অস্বাস্থ্যই শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী করেছিল মহেঞ্জোদরোকে! হয়ত মড়কের বেশে তা-ই মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিল তার দুয়ারে। তবুও এই অনুমান শেষ কথা হতে পারে না। কেননা মহেঞ্জোদরো একটি নগর মাত্র নয়—একটি সভ্যতা। তার অন্য পীঠও ছিল। দ্বিতীয় কারণ বলা চলে—সিন্ধু। হয়ত সিন্ধুর গর্ভে যেমন মহেঞ্জোদরোর জন্ম, তেমনই লয়ও তার সিন্ধুর গর্ভেই। বন্যা মহেঞ্জোদরোতে অজ্ঞাত ছিল না। নগরের বাইরে প্রায়

এক মাইল লম্বা একটি বাঁধের অবশেষ থেকে অনুমান করা চলে মহেঞ্জো-দরোর নাগরিকরা সে বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারও ছিল। হয়ত বিলাসে মত্ত নগরী ক্রমে তাকে অবহেলা করতে শিখেছিল। হয়ত সর্বনাশ সেই রন্ধ্রেই ছাড়পত্র পেয়েছিল। এটাও অনুমান মাত্র। কারণ শহরের শেষ-দিনে বন্যার যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তৃতীয় অনুমান—মহেঞ্জোদরো সভ্যতার ঘাতক যে সে মহেঞ্জোদরোর কীর্তিমান সভ্যতাসাধকেরাই। আজ এই এলাকায় গ্রীষ্মে গড় উত্তাপ ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, বৃষ্টিপাত বছরে ৬ ইঞ্চির বেশি নয়। কিন্তু একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে মহেঞ্জোদরোর আবহাওয়া বরাবর এমন ছিল না। এক সময় এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হত। শহরের নর্দমা নিয়ে এত উদ্বেগের সেটাও বোধহয় একটা কারণ। তাছাড়া বাঘ থেকে শুরু করে মহেঞ্জোদরোতে এমন অনেক প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় এককালে এই এলাকায় অনেক বনভূমি ছিল। হাজার হাজার বছর ধরে তারই আগুনে সভ্যতার যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়েছে মহেঞ্জোদরোর নাগরিক—ইট পুড়িয়েছে। সেই সঙ্গে হয়ত নিজেদের ভাগ্যও। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে উর্বর সাম্রাজ্যকে ক্রমে রুক্ষ মরু-অঞ্চলে পরিণত করে। সন্দেহ নেই মহেঞ্জোদরো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তবুও মহেঞ্জোদরো সুখী গৃহস্থের মত দেব-নাম কীর্তন করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেনি।

প্রমাণ—ক'টি অচেনা হাতিয়ার আর কয়েকটি কঙ্কাল। শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটির আর কোন স্মৃতি নেই, সাক্ষী নেই। মহেঞ্জোদরোর আশ্চর্য সুন্দর লিপিগুলো আজও হিজিবিজি মাত্র, এখনও তার পাঠোদ্ধার হয়নি। জনপথ নীরব, বাড়িগুলো বিষাদে মৌন। কারও মুখে কোন কথা নেই। একমাত্র বাঙ্ময় একটি অন্য ধরনের কুঠার, আর এখানে ওখানে কুড়িয়ে পাওয়া উন্নত গড়নের কয়েকটি তামার তলোয়ার। প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিজয়ী শত্রু অবহেলায় জঞ্জাল স্তূপে ছুড়ে দিয়েছিল হাতের অস্ত্র। তাদের আগমন-বার্তা নিশ্চয় মহেঞ্জোদরোর অগোচর

ছিল না। নাগরিকেরা জেনেছিল শান্তির দিন ফুরিয়ে এল, সীমান্তে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত সে খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ বা তার কাছাকাছি কোন কাল। তাড়াহুড়ো করে ওরা নিজেদের সোনাদানা সব মাটির নীচে পুঁতেছিল। কয়েকটি তেমন গুপ্ত রত্নভাণ্ডারেও সন্ধান পাওয়া গেছে। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। খোলা তলোয়ার হাতে একদিন সত্যিসত্যিই এসেছিল শত্রু। নির্দয় হাতে সব কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সনে হরপ্পায় একটি পরিবারের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতির দাঁতের কারিগর ছিল ওরা। বিপদ দেখে নিজেদের ধন জন নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। পারেনি। সকলে এক সঙ্গে বীভৎস মৃত্যুকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। লুঠেরা সব নিয়েছিল। শুধু পিছনে ফেলে গিয়েছিল দুটি হাতির দাঁত। ওরা নিশ্চয় তার ব্যবহার জানত না। মহেঞ্জোদরোও এই মৃত্যুই দেখেছে। সেখানে যেসব কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার মধ্যে অধিকাংশ পাওয়া গেছে একটি বাড়ির ভেতর। এক সঙ্গে নানা বয়সের কতগুলো নারী পুরুষ শিশু। কারও কারও মাথা বিচ্ছিন্ন—অধিকাংশের দেহের অবশেষে আঘাতের চিহ্ন। অদূরে আরও হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত নাটক। সিঁড়িতে একটি তরুণীর কঙ্কাল। বোধ হয় মেয়েটি পালাতে চেয়েছিল। সিঁড়ির নীচে একটি কুয়ো। হয়ত তাতে ঝাঁপ দিয়ে মরে বাঁচতে চেয়েছিল বেচারা। কিন্তু ভাগ্য অন্য। ছুটতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ বোধহয় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল ভয়ার্ত নারী—তার হাঁটুর একটি হাড় নাকি ভাঙা। শত্রু তাকেও রেহাই দেয়নি—এই মেয়েটির মাথাও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন!

কারা এসেছিল সেদিন? মহেঞ্জোদরোর জীবনে ভয়াবহ সেই শেষ দিনটিতে? কেউ নিশ্চয় করে কিছু জানে না। বিজয়ী ঘাতকের জবানবন্দী নাকি একমাত্র পাওয়া যায়—ঋকবেদে! '—হে ইন্দ্র তুমি শত্রুধর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বজ্র দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর!'...পণ্ডিতেরা বলেন, মহেঞ্জোদারো যিনি ধ্বংস করেছিলেন তিনিও এই ইন্দ্র—সেই মেয়েটির ঘাতকেরা নাকি জাতি পরিচয়ে আর্য!

॥ কেবল গোলাপের উপমা নয় ॥

—শুধু ঝান্সী নয়, আমরা মতি সাইনকেও চাই। দাবি জানিয়েছিলেন মধ্য ভারতে ইংরেজদের প্রতিনিধি। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে তিনি আত্মসমর্পনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ নয়, দাবি-পত্রে অন্যতম শর্ত মতি সাইনকেও চাই!

চিঠিখানার বয়ান শুনে লক্ষ্মীবাঈ সেদিন নিশ্চয় মনে মনে হেসে-ছিলেন। হয়ত এক সময় মতিকেও কাছে ডেকে কানে কানে বলেছিলেন—হ্যাঁরে, তুই আবার সাইন হলি কবে?—ফিরিঙ্গীরা তোর ঝাড় ফুঁকে খুশি; এবার যে তারা খোদ সাইনকেই চায়! যাবি? মতি নিশ্চয় খিল খিল করে হেসে উঠেছিলেন রাণীর কথা শুনে।—যাব বৈ কি! নিশ্চয় যাব। সার হিউ রোজ যখন স্মরণ করেছেন মতি কি তখন তাঁকে নিরাশ করতে পারে?

মতি সাইন মানে মতি, ফকির। ১৮৫৭ সনের সেই আগ্নেয় দিনগুলোর কথা। মধ্য ভারতের ইংরেজ ছাউনিতে ছাউনিতে উদ্বিগ্ন ইংরেজ সেনা-নায়কদের মুখে মুখে থেকে থেকেই এই একটী নাম; মতি সাইন আর মতি সাইন। কোন চাল গোপন রাখার উপায় নেই; মতি সাইনের চররা রয়েছে। তারা তৎক্ষণাৎ সে খবর বয়ে নিয়ে যাবে ঝান্সীর প্রাসাদে। কোন দিক থেকে রসদ আসছে, কারাই বা পাঠাচ্ছে সব আজ রাণীর নখদর্পণে। ইংরেজদের সব মতলব তাঁর মুখস্থ। মতি সাইন ক্যাম্প-এর শেষ খবরটিও কুড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে তাঁর কাছে।—অসহ্য!—অসহ্য! মাটিতে বুট ঠুকলেন সার হিউ রোজ।—মতি সাইনকে তাঁর চাই। চাই-ই চাই।

পরের বছর (১৮৫৮) এপ্রিলে যুদ্ধ রাজধানীর দুয়ারে এসে ঠেকল। ঝান্সীর আত্মসমর্পণ দাবি করল ইংরেজ বাহিনী। সেই সঙ্গে আরও একটি যুদ্ধ-পুরস্কার—আমরা ঝান্সীর সঙ্গে মতি সাইনকেও চাই। তাজ্জব,

বিরক্ত, উদ্বিগ্ন ইংরেজেরা তখনও জানে না মতি সাইন কোন মুসলমান ফকির নন, ঝান্সীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আসলে একজন মহিলা। নাম তাঁর মতি সাইন নয়, মতিবাঈ। ঝান্সীতে কে না চেনে ওঁকে ?

সে পরিচয় যে মতিবাঈয়ের একমাত্র পরিচয় নয়, ক্রমে সেটাও একদিন জানতে পেরেছিল ওরা। নগরের সেরা নর্তকী, ঝান্সীর সেরা অভিনেত্রী মতিবাঈয়ের তখন অন্য রূপ। তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অন্যতম সহচরী, সহযোদ্ধা। রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর হাতে। নিখুঁত তাঁর বিধি ব্যবস্থা, ত্রুটিহীন জাল। মতিবাঈয়ের চরেদের অগোচরে কিছু করার উপায় নেই। শত্রুরা স্তম্ভিত, বিচলিত। শুধু কি বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার ? সাহসিকতায়ও রূপবতী নর্তকী বিদ্রোহী ঝান্সীর দাউ দাউ আগুনে একটি উজ্জ্বল শিখা। শত্রু যখন নগর তোরণে এই মতিবাঈই তখন নগর রক্ষকের অধিনায়িকা। রাণী নিজে যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে নগরের রক্ষা ব্যবস্থা তদারক করছেন, সহচরী মতিবাঈ তখন শত্রুর মোকাবেলায় ব্যস্ত। দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন তিনি তখন। কামানের ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল ঝান্সীর বিখ্যাত নর্তকীকে, নতুন আসরে তিনি গোলন্দাজদের পরিচালনা করছেন। গোটা ঝান্সী শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়েছিল। রাণী লক্ষ্মীবাঈ অতুলনীয়া, তামাম হিন্দুস্থান মেনেছিল—মতিবাঈও গোলাপ মাত্র নন !

শুধু মতিবাঈ নন, ললিতা, ঝালকারি, সুন্দর—ঝান্সী রাণী লক্ষ্মী-বাঈয়ের প্রতিটি সহচরী যেন এক একটি সিংহী।

ললিতাবাঈ বকশী ছিলেন, মহারাজা বকশীর স্ত্রী। আজন্ম সুখের পায়রা। কিন্তু ঝান্সীর দুয়ারে যেদিন শত্রু সে দিন এই ললিতাই চাতুর্যে আর ক্ষিপ্রতায় শিকারী বাজ পাখিটি যেন। দেখতে দেখতে বিরাট স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে ফেললেন তিনি। ঝালকারি, সুন্দর, কাশীবাঈ, মান্দার—অনেক বেপরোয়া তরুণী তাঁর সঙ্গিনী। কর্মীরা যখন নগর রক্ষার জন্য নতুন নতুন কামান বসাচ্ছেন, প্রতিরোধ দেওয়াল গড়ে তুলছেন—তখন ওঁদের স্বেচ্ছাসেবিকারা তাঁদের ইট কাঠ বয়ে এনে

দিচ্ছেন। কাছে ভিতে মাটি নেই। মাটি আনতে হবে দুর্গের দক্ষিণে ঝরণা-গেট-এর কাছে যে স্তূপটি সেখান থেকে। সেই তোরণ লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু গোলা ছুঁড়ছে ইংরেজ গোলন্দাজরা। ললিতা তবুও অবিচল। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের পরিচালনা করতে লাগলেন। ওঁরা ক্ষিপ্র হাতে সেখান থেকে মাটি নিয়ে আসছেন।

শুধু মাটি নয়, সৈন্যদের পানীয় জল নেই। জল আছে মাত্র দু'টি জায়গায়, পাতকুয়ায় আর ঝরণায়। সেখান থেকেই বরাবর জল আনেন ঝান্সীর লোকেরা। কিন্তু এপ্রিলের সেই তপ্ত দিনগুলোতে বিশেষত এই দুটি জায়গা আরও বিপদজনক। শত্রু ক্রমাগত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে কুয়ো এবং ঝরণা লক্ষ্য করে। তারই মধ্যে জল আনছেন ললিতার নারীবাহিনী। ঘরের বউ ললিতা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের পরিচালনা করছেন।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই একসময় চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা। শত্রু চারিদিক থেকে নগরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ললিতার চোখে পড়ল, দেওয়ালের এক কোণে একটি গাছের ডাল থেকে একখানা মই ঝুলছে। ক' মিনিটের মধ্যেই রহস্যটা বোঝা গেল। ললিতা দেখলেন—মই বেয়ে বেয়ে দু'জন ইংরেজ অফিসার দেওয়ালে নামবার চেষ্টা করছে। আর সময় নষ্ট করা যায় না। ললিতা ঘোড়াটাকে নিঃশব্দে দেওয়ালের পাশে দাঁড় করালেন। একজন সঙ্গিনী তাঁকে পেছন থেকে ধরে বসে থাকল। ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে পর পর দু'টি গুলিতে দুই ফিরিঙ্গীকে তিনি দেওয়ালের ওপারে মাটিতে ছুঁড়ে দিলেন। কোথা থেকে কী হয়ে গেল অফিসার দু'জন তা জানতেও পারল না। দূরে ছাউনিতে দাঁড়িয়ে দলের পর্যবেক্ষকেরা শুধু শুনল ভোরের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দুর্গের ভেতর থেকে দু'টি গুলি বেরিয়ে এসেছে, মইয়ে অফিসার দু'জন নেই!

ঝালকারি যেন আরও দুর্দ্ধর্ষ। মই বেয়ে এবার যিনি ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং লেফট্যান্যান্ট বন্। হাতে বন্দুক ছিল না। সামনে ছিল বিরাট একটা পাথর। দেওয়ালের ওপর থেকে সেটাই সাহেবের দিকে ঠেলে দিল মেয়েটি। বন ব্যর্থ হলেন। তিনি গুরুতর আহত।

আগুন ক্রমে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল। দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে ঝান্সীর বীর গোলন্দাজেরা একে একে প্রাণ দিলেন। লক্ষ্মীবাঈ তবুও পরাজয় মেনে নিতে রাজি নন। তাঁর ডাকে সুন্দর আর ললিতা এগিয়ে গেলেন কামানের দায়িত্ব নিতে। লক্ষ্মীবাঈ আগেই তাঁদের এ বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করে রেখেছিলেন। ললিতা যে সত্যিই কামান চালাতে জানতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বোঝা গেল। তাঁর নির্ভুল তাক সোজাসুজি আঘাত হেনে ইংরেজ পক্ষের দু'টো কামানকে স্তব্ধ করে দিল। দিনভর প্রবল বিক্রমে লড়াই চালিয়ে গেলেন ঝান্সীর বাঘিনী। সন্ধ্যায় তারই স্বীকৃতি জানাতে যেন শত্রুপক্ষের একটা গোলা এসে পড়ল ওঁর পায়ের সামনে। সেলাম জানাচ্ছে ইংরেজ গোলন্দাজরা? বীরাঙ্গনা ললিতা মাটিতে ঢলে পড়লেন। খবর শুনে ছুটে এলেন স্বয়ং লক্ষ্মীবাঈ। সিংহীর মত রাণী নাকি সেদিনই শুধু কেঁদেছিলেন।

সুন্দরের মৃত্যুও এমনই অপূর্ব সুন্দর। সে দায়িত্ব নিয়েছিল ওরছা দরওয়াজার (Orchha Gate)। সেখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল কুখ্যাত দুলহাজু বুন্দেলা। শত্রুর সঙ্গে গোপনে গোপনে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিল সে। ইংরেজদের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল ওরা যত গোলাই ছুঁড়ুক দুলহাজু তার উত্তর দেবে না। শত্রুপক্ষ এগিয়ে এলে সে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াবে। ওর মতিগতি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল সুন্দরের। তিনি বাতাসে চক্রান্তের আভাস পেলেন। দুলহাজুকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজেই কামানের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইংরেজরা অবাক। অবিরাম গোলা বর্ষণ করছে ওরছা দরওয়াজার সৈনিকেরা। ওরা তখনও জানে না, কামানগুলো তখন আর দুলহাজুর হাতে নেই, সে পালিয়ে গেছে। ঝান্সীর ইজ্জত রক্ষার্থে এখন লড়াই করছেন একটি তরুণী, নাম তাঁর—সুন্দর। সুন্দরও ললিতার মত দুর্গ-তোরণেই প্রাণ দিয়েছিলেন। ফুল হয়ত। তবুও ওঁরা গোলাপ নয়; ললিতা, সুন্দর ওঁরা সেই জাতের ফুল যা স্বাধীনতার পুজোয় লাগে।

আরও দু'টি ফুল ছিল ঝান্সীর বিখ্যাত নেত্রী লক্ষ্মীবাঈয়ের পুজোয়

থালায়। একজন তাঁদের মান্দার, অন্যজন—কাশীবাঈ। মান্দার ছিলেন লক্ষ্মীবাঈয়ের ছায়া, সব সময় তিনি রাণীর পাশে পাশে। ঝান্সী, কলপি, কনূচ, কাচগাঁও—যেখানে রাণী, সেখানেই তিনি। ঘোড়ার পিঠে, তলোয়ার হাতে তুর্দ্ধর্ষ রমণী মান্দার রাণীর মতই লড়াইয়ের মাঠেও। ঝান্সী এবং আশেপাশের সব ক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কাশীবাঈও তা-ই। রাণীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল তাঁর চেহারার। সেবার ইংরেজ সৈন্যরা যখন রাণীকে ধরবার জন্য তাঁর পেছনে ছুটছে তখন ক'জন অনুচর নিয়ে হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাশীবাঈ। ইংরেজদের সঙ্গে এক হাত মুখোমুখি লড়াই করে তাদের চোখের সামনেই যেন ঝান্সীর রাণী অন্য পথ ধরলেন। আঘাতটা সামলে উঠে ওরা আবার তাঁর পিছু ধরল। কাশীবাঈ মায়াবিণীর মত হাতছানি দিয়ে তাদের ভুল পথে টেনে নিলেন। রাণী ততক্ষণে নিজের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ইংরেজেরা ব্যাপারটা যখন বুঝতে পেরেছে তখন তাদের সামনে রাণী তো নেই-ই, কাশীবাঈও নেই। আলেয়ার মত বন পথে কোথায় যেন হারিয়ে গেল মায়াবিনী।

জুনের ১৭ তারিখে (১৮৫৮) গোয়ালিয়র তুর্গের অদূরে জেনারেল স্মিথ-এর বাহিনীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল রাণী এবং তাঁর সঙ্গীনীদের। শত্রুকে মোকাবেলা করতে প্রথম এগিয়ে গেলেন মান্দার আর কাশীবাঈ। পরবর্তী আঘাতটি হানলেন রাণী এবং তাঁর রোহিলা অনুচরেরা। জেনারেল স্মিথ পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু পরের দিন বিপর্যয়। রাও সাহেব আর তাঁতিয়া টোপি ইংরেজদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ের পথ নিয়েছেন। রাণীর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। কিন্তু ওঁদের বোঝান গেল না। সুযোগ পেয়ে কোট-কি-সরাইয়ের সামনে স্মিথ লক্ষ্মীবাঈয়ের ছোট্ট দলটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে লড়াই করে লক্ষ্মীবাঈ খোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর সঙ্গে প্রাণ দিলেন তুই সহচরী, মান্দার আর কাশীবাঈ। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যদি সিংহী হন, তবে ওঁরা ঝান্সীর বাঘিনী।

শুধু ঝান্সী নয়, গোলাপের উপমা ১৮৫৭-৫৮ সনের ভারতের অনেক প্রাসাদে, অনেক ঘরেই অচল। সিপাহী বিদ্রোহের দিনে দিল্লীর বৃদ্ধ 'বাদশাহ' বাহাদুর শাহের কাহিনী সুখ্যাত। অক্ষম ক্লীব বাদশাহকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দেশের ইজ্জত রক্ষার্থে সেদিন হারেমের অন্ধকার থেকে মশাল হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন যিনি তিনি একজন বেগম। ঝিনাৎ মহল আহ্বান জানিয়েছিলেন—হিন্দুস্থানের প্রিয় সন্তানেরা, অস্ত্র থেকে হাত সরিয়ে নিও না। আজ যদি আমরা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারি তবে শত্রুর ধ্বংস অনিবার্য। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অনিবার্য। কারণ যাই হোক, সেদিন দিল্লীর মর্যাদা রেখেছিলেন তিনি। সারা ভারত তাঁর ফরমানে উদ্বেলিত। বীরত্বে তাঁকেও পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মৌর নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের স্ত্রী বেগম হজরত মহল এবং তুলসিপুরের রাণী।

তুলসিপুরের রাণীর কাহিনীটি আরও উল্লেখযোগ্য কারণ তুলসীপুর কোন রাজ্য নয়, উত্তর দেশে সামান্য একটি জায়গীর মাত্র। সেখানকার রাজা নির্বাসনে মারা গেছেন। রাণী বিধবা, তাঁর বিশেষ কোন সহায় সম্বল নেই। তবুও দেশময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে গলা মেলাতে ইতঃস্তত করলেন না তিনি। শুধু কি তাই? বিদ্রোহী নানা সাহেবের ভাই বালা সাহেব পালিয়ে ফির.ছেন। কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস পাচ্ছেন না। রাণী বললেন—আমার রাজ্যের দুয়ার আপনার জন্য খোলা রইল। স্বভাবতই একদিন সার হোপ গ্রাণ্ট-এর বাহিনী এসে তুলসিপুর ঘিরে দাঁড়াল। সেটা ১৮৫৮ সনের ডিসেম্বর-এর কথা। বিরাট ইংরেজ বাহিনী। রাণীর বাঁশের কেল্লা তার সামনে কিছু নয়। তবুও পুরো সাতদিন হোপ গ্রাণ্টকে ঠেকিয়ে রাখলেন রাণী। তাঁর ছোট্ট বাহিনীটির তিনিই অধিনায়িকা। অষ্টম দিনে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ব্রিগেডিয়ার রোক্রফট-এর নেতৃত্বে নতুন ফৌজ। তাদের সঙ্গে যোগ দিল স্থানীয় একজন বিশ্বাসঘাতক—বলরামপুরের রাজা। অতঃপর দুর্গ রক্ষার চেষ্টা অবান্তর। বিধবা-রাণী তবুও সাদা পতাকা ওড়ালেন না।

তাঁর মৃতদেহ ডিঙিয়েই ইংরেজ ফৌজ সেদিন তুলসিপুরে ঢুকতে পেরেছিল।

বিলাসী নবাব ওয়াজিদ আলী খানের পত্নী হজরত মহল স্বনামধন্যা। তাঁর বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার কাহিনী সকলের জানা। ১৮৫৭'র বিদ্রোহে লক্ষ্মীবাঈয়ের মতই তিনি এক অতুলনীয়া নায়িকা। শেষ পর্যন্ত অপরাজিতা ছিলেন তিনি। ইংরেজেরা বহু চেষ্টা করেও লক্ষ্মৌর এই দুর্দ্ধর্ষ অধি-নায়িকাকে ধরতে পারেননি। হজরতমহল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজাধীন ভারতে নয়, স্বাধীন নেপালের মাটিতে। তিনি শুধু স্বাধীনতার জ্বলন্ত মশাল নন, তাঁর চোখের আগুনে লক্ষ্মৌর অসংখ্য গোলাপের মনে মনে সেদিন দাউ দাউ আগুন। উপসংহারে ওদেরই দু'চার জনের কথা শোনাই।

গর্ডন আলেকজাণ্ডার লিখেছেন: সিকেন্দর বাগের লড়াইয়ে সেকি প্রবল প্রতিরোধ! গুলি করে ক'টি সৈন্যকে হত্যা করা হল। হত্যা করার পর জানা গেল ওরা মেয়ে! আলেকজাণ্ডার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে সম্মান জানিয়েছেন তাঁদের—দে ফট লাইক ওয়াইল্ড ক্যাট্স! হজরত মহলের প্রেরণায় লক্ষ্মৌর সামান্য বালিকাও সেদিন দুর্দ্ধর্ষ বন-বেড়ালি। ফরবেস-মিচেল এই সিকেন্দর বাগেই আর একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি অশ্বত্থের ডালে বসে তিনি একের পর এক ইংরেজকে ভূতলশায়ী করে যাচ্ছেন!

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। লক্ষ্মৌর পতনের ক'দিন পরের কথা। বিজয়ী সৈন্যদের হঠাৎ চোখে পড়ল গোমতীর ওপরে লোহার সেতুটার নীচে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, কাছে গিয়ে দেখা গেল জনৈকা বৃদ্ধা 'a wrinkled hag with age grown double' মরে পড়ে আছেন। তাঁর এক হাতে একটু তুলো অন্য হাতে আধপোড়া একটি পলতে। চার পাশের জঞ্জাল সরানোর পর দেখা গেল সামনেই একটি বাঁশের চোঙ, তাতে বারুদ। অদূরে মাটির তলায় প্রকাণ্ড মাইন!

তারপরও কি কেবল গোলাপের উপমাই চলে?

॥ হারেম ॥

আমি ভেবে পাচ্ছি না একজন মাত্র জেনানাকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথাবার্তা, মারপিটের কী মানে হয়! পশ্চিমা কোন সিনেমা শো থেকে ফেরার পথে সঙ্গীকে বলছেন জনৈক পূর্বদেশীয় শেখ।—লক্ষ্য করেছ তো জেনানা ছিল মাত্র একটি!

—হুঁ! উত্তর দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গী।—আমিও তো তাই ভাবছি।

মধ্য প্রাচ্যের কোন দেশে কোন সুলতান আর তাঁর কোন পার্শ্বচরের মধ্যে সত্যিই কোন সন্ধ্যায় এ ধরনের কোন কথাবার্তা হয়েছিল কিনা বলা মুশকিল। কথোপকথনটি প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমের একটি হাসির কাগজে। একটি ব্যঙ্গ-চিত্রের তলায় রঙ্গ হিসাবে।

এই রঙ্গের উপলক্ষ্য, বলা নিষ্প্রয়োজন, পূর্বপৃথিবীর একটি বিশেষ কুঠি, নাম যার—হারেম। হারেম পৃথিবীতে এক আশ্চর্য স্বপ্নলোক। তাকে ঘিরে যুগ থেকে যুগান্তরে নানা কল্পনা, কৌতূহল, রটনা। পূবের হারেম উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে—চিরকাল লোভনীয় সংবাদ। কিন্তু হারেম কি সত্যিই খবর হওয়ার মত?

এ সম্পর্কে অবশ্যই বিতর্ক চলতে পারে। তুরস্কের সুলতান তাঁর অন্দরমহলটির নাম দিয়েছিলেন—হারেম। সমসাময়িক আর পাঁচজন ভদ্রজনের মতই তিনিও তাঁর পত্নী এবং পরিবারের অন্য মহিলাদের স্বতন্ত্র করে রাখতে চেয়েছিলেন মাত্র। হারেম অতএব, সেদিক থেকে কোন লোমহর্ষক ঘটনা নয়। হারেম শব্দটি এসেছে 'হারাম' থেকে। 'হারাম' মানে নিষিদ্ধ, হারেম—নিষিদ্ধ এলাকা। পারস্যে ওরা বলত—অন্দরম। মোগলেরা কেউ কেউ বলতেন—জেনানা। পারসিক 'জান' মানে মহিলা। জেনানা মানে 'জানানখানা' বা মেয়েদের বাসস্থান। সুতরাং, হারেম

শব্দটির মধ্যে বিশেষ কোন চাঞ্চল্যকর খবর নেই। পৃথিবীর সর্বত্র রাজ-প্রাসাদের অন্দরমহলের মতই প্রাচ্যের হারেমও ইট কাঠে গড়া কতকগুলো ঘর মাত্র। সেখানে মেয়েরা থাকেন।

প্রশ্ন উঠবে ক'জন মেয়ে? ঐতিহাসিকের কানে এই প্রশ্নটাই নাকি হারেমে ঢোকার চাবিকাঠি। যত বড় বাদশা তত বেশী ঘর, তত নারী। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের হারেমে মেয়ে ছিলেন নাকি চার হাজার। মহম্মদ তুঘলকের সৌখিন পৌত্র মকবুলের ছিল নাকি দু'হাজার। এমন যে ভদ্র বাদশাহ আকবর, আবুলফজল বলে গেছেন তাঁর হারেমেও নারী ছিলেন পাঁচ হাজার। জাহাঙ্গীরের হারেম খাতে দৈনিক খরচ ছিল তিরিশ হাজার টাকা। শাজাহানও বিখ্যাত সৌখিন। আউরঙ্গজেব ততখানি বিলাসী ছিলেন না। মানুচ্চি বলেন, তাঁর হারেমে রূপসী ছিলেন দুই হাজার। সুতরাং এবার যে কার্টুনটির উল্লেখ করব সেটি বোধহয় বাড়াবাড়ি কিছু নয়। ছবিটি কিছুই নয়, দু'জন উদ্বিগ্ন শেখ কথা বলছেন। একজনের বক্তব্য: আমি বোধহয় এবার পলিগেমি-র দায়ে পড়ব।—কেন? অন্যজন জানতে চাইলেন। উত্তর হল—আমার যে ভাই দু'টো হারেম!

"ফিগার" থেকেই "ফ্যাক্ট" আঁচ করা একালে চলতি রীতি। সুতরাং, এক্ষেত্রেও তা-ই চলেছে।—একজন পুরুষ, পাঁচহাজার নারী! বাপ্‌রে! হারেম স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের যুগপৎ বিস্ময়, কৌতুহল, কল্পনা এবং ঘৃণার বস্তু। হয়ত বা কারও কারও কামনারও।

প্রথমে শেষোক্ত দলের জন্য কয়েকটা খবর। হারেম শুধু রূপসীর হাট নয়—ষড়যন্ত্রেরও অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে নিত্য কলহ, কোন্দল, কানা-কানি ফিসফাস। রাণী রাতভোরে দাসী, বেগম সেখানে বাঁদী, বাঁদী বেগম। সুতরাং কোনটা আনন্দের মুহূর্ত, কোনটা অন্তিম—সম্রাট নিয়ত সে-ই ভাবনায়ই ব্যতিব্যস্ত। 'প্যালেস ইনট্রিগ'—কথাটা একালে যে-অর্থেই চলুক না কেন, এর আদি চার দেওয়ালে ঘেরা সুসজ্জিত সে-ই মহলটি, নাম যার—হারেম। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সেখানকার সব কাহিনী

জানা গেলে মস্ত মস্ত রাজবংশগুলোর পরিচয়পত্রগুলো সব নতুন করে লেখা যেত। কেন, সে কাহিনী এখানে সবিস্তারে আলোচনার সুযোগ নেই। ক্ষুদে একটি রাজ্য লক্ষ্ণৌর ইতিহাস একটু খুঁটিয়ে পড়লেই তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। তার পৃষ্ঠা থেকেই ছোট্ট একটি কাহিনী।

দুলারী নামে লক্ষ্ণৌর চক-এ মেয়ে ছিল একটি। রূপসী স্বাস্থ্যবতী। নাসিরুদ্দীন তখন লক্ষ্ণৌর নবাব। তাঁর বিরাট হারেম, সেখানে নানা-দেশের ফুলের বাগিচা। তার মধ্যে নবাবের সবচেয়ে প্রিয় যে ফুলটি নাম ছিল তার আফজল মহল। ১৮২৫ সনে আফজল মহল নবাবের কাছ থেকে সব সেরা উপহার লাভ করলেন,—তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ছেলের নাম মুন্নাজান। শিশু মুন্নাজানকে লালন পালন করবে কে? হারেম চরেরা হাট থেকে খুঁজেপেতে দুলারীকে নিয়ে এল। সেকালেও ফসটার-মাদার ব্যবস্থার চল ছিল—নিজের বুকের দুধে গরীব মেয়েরা রাজাবাদশার সন্তানকে পালন করতেন। দুলারীও সে-ই কাজে নিযুক্ত হল। ঘটনার সূত্রপাত সেখানেই।

তারপর হঠাৎ একদিন রাজ্যময় হুলুস্থুলু—কানাকানি ফিসফাস; উত্তেজনা আলোড়ন! শোনা গেল নাসিরুদ্দিন দুলারীর প্রেমে হাবুডুবু। আফজল মহল বাতিল হয়ে গেছেন। পথের মেয়ে দুলারীই এখন পাটরাণী। নবাব তার নাম দিয়েছেন—মলিকা জামানি। নবাব ঘোষণা করেছেন—মুন্নাজান নয়, আমার পরে লক্ষ্ণৌর নবাব হবে—দুলারীর গর্ভজাত সন্তান কৈয়ান ঝা! এতেও হয়ত অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এর পরেও নাটকের আরও একটি অঙ্ক বাকি ছিল। বৃদ্ধ নাসিরুদ্দিন জানতেন কৈয়ান তাঁর পুত্র নয়! সে আসলে রুস্তম নামে কোন ফেরিওয়ালা কিংবা একাওয়ালার পুত্র, নবাবের আগে সে-ই ছিল দুলারীর প্রেমিক!

সুতরাং, তার পরেও বোধ হয় হারেম খুব লোভনীয় স্বর্গ নয়। সেখানে আউরঙ্গজেব-এর স্বাভাবিক আচরণ অতি কম পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। হারেমের অবধারিত বিষক্রিয়ায় স্বাভাবিকতার মৃত্যু অনিবার্য। আকবর-

জাহাঙ্গীর-আনারকলি উপাখ্যান সর্বজন বিদিত। কন্যার সামনে তার গোপন প্রেমিককে নাকি গরম জলে ফুটিয়ে হত্যা করেছিলেন শাজাহান। কন্যার দ্বিতীয় প্রেমিক নজর খাঁকেও নিঃশব্দে সরিয়েছিলেন নাকি তিনি হাতে বিষ মেশান পান গুঁজে দিয়ে। বার্নিয়ের বলেন—এসব নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে অন্যতম ব্যতিক্রম আউরঙ্গজেব। রোন রৌশন আরা যথারীতি জনৈক যুবকের প্রেমে পড়েন। গোপনে তিনি হারেমে আসা যাওয়া করতেন। একদিন ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলেন বেচারা। খোজারা ধরে এনে তাঁকে হাজির করল সাক্ষাৎ বাদশাহের সামনে। আউরঙ্গজেব গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। তারপর বললেন—উঁহু, কিছুই প্রমাণ হল না। শুধু এটুকুই বোঝা গেল এই পার্সি তরুণ দেওয়াল টপকে অন্দরে এসেছিল। দেওয়ালের ওপর দিয়েই তাকে আবার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সম্রাট নাকি উঁচু দেওয়াল থেকে ছেলেটিকে নীচে ঠেলে ফেলে দিতে বলেন নি, অথচ খোজারা নাকি তা-ই করেছিল। সেটা খোজাদের দোষ, সম্রাটের নয়। বার্নিয়ের লিখেছেন—বাঁশের চেয়ে চিরকালই কঞ্চি দড় !

রৌশন আরার দ্বিতীয় প্রেমিককেও মুক্তি দিয়েছিলেন আউরঙ্গজেব। সে এসেছিল দেওয়াল টপকে বা পেছনের দরজা দিয়ে নয়,—সামনের ফটক দিয়েই। সুতরাং সম্রাট বললেন—তাকে সে পথেই ফিরে যেতে দাও। শাস্তি পেল প্রহরী খোজার দল, যারা চোর ধরেছিল তারাই। কেননা সম্রাট বললেন—দোষ, যে এসেছে তার নয়, সদর দরজায় যারা পাহারা দেয় তাদেরই। কারণ তরুণটি তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে ! এই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারেম-অধিপতিদের মধ্যে সত্যিই সুদুর্লভ।

এবার আরও একটা পশ্চিমী কার্টুন-এর কথা। দৃশ্যস্থল : কোন হারেমের অভ্যন্তর। চারদিকে জমাট নাইট-ক্লাব যেন, রাশি রাশি উগ্র, উদ্ধত সুন্দরীর ভিড়। অদূরে অপেক্ষাকৃত বর্ষিয়সী জনাকয়। সুলতানকেও দেখা যাচ্ছে। তিনি একটি বিশেষ মেয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এই মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, ছবি দেখেও বোঝা যায় রীতিমত তরুণী। বিবস্ত্র

পরিণত বয়স্কারা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। একজন ফিসফিস করে অন্য জনকে বলছেন, আগেই বলেছি, এখানে সিনিঅরিটির কোন দাম নেই!

হাসির ব্যাপার এটুকুই। মন্তব্য পড়ে নিশ্চয় বিস্তর হাসাহাসি করেছেন একালের পশ্চিমী পাঠক এবং দর্শক। কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইতিহাস বলে, হারেমে শুধু তাজা গোলাপ নয়, প্রবীণাদেরও মর্যাদা ছিল। প্রাসাদের অধিকারী যিনি তুরস্কে তাঁর নাম—'সুলতানা ভালিদ।' হিন্দুস্থানে বলা হত—পাদশাহী বেগম। তিনি বাদশাহের জননী। নরনারী নির্বিশেষে সকলের মান্য। বলা নিষ্প্রয়োজন, তিনি বয়স্কাও। তার পরেই ধাপে ধাপে নেমে গেছে মর্যাদার সিঁড়ি। বয়সের প্রশ্ন সেখানে গৌণ। সুলতানের জ্যেষ্ঠ তনয়ের জননী যিনি তাঁর নাম—'বাসখাদিন এফেন্দি' বা বেগম সাহেবা। তারপরের তিনজন 'হামুম এফেন্দি,'—তাঁরাও সুলতানের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারেন। তার পরে যাঁরা তাঁরাও নানা মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত। 'ওয়াদিক', 'কিয়ারাখাত'—নানা নাম তাঁদের। তাঁদের কার কী কাজ সব ভাগ করে দেওয়া আছে। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ করা আছে মাসোহারা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মেয়ে দারোগা, একালের কীর্তি নয়। তাঁকে প্রথম দেখা গিয়েছিল মোগল হারেমেই। জেনানা-দারোগার ওপর ভার ছিল বাদশাহের ঘরের দুয়ার পাহারা দেওয়া। বলা নিষ্প্রয়োজন, ওঁরাও মাইনে পেতেন। আবুল ফজল বলেন—উচ্চপদে যাঁরা আছেন তাঁরা অনেকেই ১০২০ টাকা থেকে ১৬১০ টাকা পান। অঙ্কটা একালের সকল নারী চাকুরিয়ার তুলনায়ও সামান্য নয়। তার ওপর ছিল নানা উৎসব এবং আনন্দ দিন উপলক্ষে বোনাস-এর মত নগদ এবং আরও রকমারি উপহার। সবচেয়ে কম পায় যে মেয়েটি, আবুল ফজল বলেন—তার মাইনেও মাসে কমপক্ষে ৯০ থেকে ১০০ টাকা! খাওয়া পরা, চোখের কাজল, হাতের মেহেদি—সবই রাজ সরকারের দায়িত্ব। বাগিচা, বারান্দা, হামাম, ঝরণা, মিনার, মীণাবাজার—মানিনীদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থার কোন কমতি ছিল না।

সেদিনের অনিশ্চিত পৃথিবীতে এই নিশ্চিত জীবন—সে বোধহয় অনেক মেয়ের কাছেই সেদিন নিছক হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। একথাও মনে করা ভুল, হারেম শুধু একজন মানুষের মনোরঞ্জনেই নিয়ত মশগুল,—অহোরাত্র সেখানে কেবলই জনৈক নায়কের নামে আনন্দ সংকীর্তন। সম্রাট বা সুলতান সেটা সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু হারেম তারপর থেকেই অন্য জগৎ। তার নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব রীতিনীতি; সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের আশা আকাঙ্খা ও বাইরের দুনিয়ার মতই হাসি কান্না, সুখ দুঃখ এখানেও নিত্য প্রতিবেশী। হারেম কেবলই নিরবচ্ছিন্ন সুখ, অথবা অন্তহীন দুঃখের গল্প নয়।

তবুও একালের মানুষ আমরা, আমাদের কানে বিলাপের সুরটাই আগে পৌঁছায়। সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে জাফরি কাটা জানলা বেয়ে একই দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হাওয়াকে আকুল করে তুলতে চায়। সেটি সম্রাট নামে কথিত কোন অসহায় পুরুষের। হারেমে তিনিও বোধহয় অন্যতম দুঃখী, হয়ত বা সবচেয়ে বিফল প্রাণী। কেননা, হাতিশালে হাতি বা ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজানোর মত হারেম সাজানো সহজ খেলা নয়। এ খেলায় বহুতর আয়োজন। এবং ক্রীড়া সঙ্গী যাঁরা সবাই তাঁরা মানুষ। ফলে, হারেম চিরকাল এক অভিশপ্ত স্বর্গ যেন। এখানে লালসা আর সন্দেহ সতত কিলবিল করে।

প্রসিদ্ধ খোজাদের কথাই ধরা যাক। হারেমের 'পবিত্রতা' নিষ্কলুষ রাখার জন্য একদা তৈরী করা হয়েছিল এই সাকার হাহাকার বাহিনীকে। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যিনি সকলের আগে খোজার সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন তিনি কোন সুলতান নন, একজন অতি সাবধানী সুলতান-পত্নী। জনৈক বাইজেনটাইন সম্রাজ্ঞী। হারেম তবুও কি সর্ব 'কলুষ' মুক্ত? ইতিহাস সন্দেহে মাথা নাড়ে। আপত্তি করবেন পরবর্তী বাদশাহ এবং বেগমেরাও। কারণ একথা আজ সকলে জেনে গেছে—সেই আদি খোজাই হারেমের শেষ কলঙ্ক নয়। ভাবিত সুলতানকে তারপরও আরো কয়েকটি অমানুষিক কাণ্ড করতে হয়েছিল। তিনি সন্দেহভাজন

রূপসীদেরও একধরনের খোজায় পরিণত করেছিলেন,—তাদের চেতনাকে চিরকালের মত কেড়ে নিয়েছিলেন। খোজাকেও ক্রমে সম্পুর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিকৃত সম্পুর্ণ না হলে বাদশাহের মন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে চায় না। কেন, উপসংহারে তারই একটা কাহিনী।

বার্নিয়ের লিখেছেন—আউরঙ্গজেবের আমলে হারেমে দিদার খাঁ নামে খোজা ছিল একজন। তার হাতে টাকাকড়ি ছিল, ক্ষমতাও ছিল। শহরেই নিজস্ব একটি বাড়ি করেছিল সে। সে বাড়ির পাশেই থাকতেন এক হিন্দু কেরানী। তাঁর একটি সুন্দরী বোন ছিল, সে খোজা দিদার খাঁকে ভালবাসে, গভীর ভালবাসা। দেখতে দেখতে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে খবরটা রটে গেল। যথাসময়ে খবরটা কেরানী ভদ্রলোকটির কানে পৌঁছল। তিনি বোন এবং দিদার দু'জনকেই হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু খোজার প্রেম, বার্নিয়ের-এর ভাষায়—তখন কবির প্রেমকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, সে সাবধান হওয়া প্রয়োজন মনে করল না। পাড়া প্রতিবেশীদের মুখে লাঞ্ছিত, অপমানিত কেরানী সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। একদিন প্রণয়ীযুগল হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। ক্ষিপ্ত কেরানী তলোয়ারের ঘায়ে এক সঙ্গে দুজনকেই হত্যা করলেন। শয্যায় পাশাপাশি দু'টি মৃতদেহ। একটি জনৈক খোজার, অন্যটি একজন স্বাভাবিক তরুণীর। বার্নিয়ের লিখছেন—এই ঘটনায় হারেম ও বেগম মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল।

শুধু হারেম আর বেগম মহলেই? উদ্বিগ্ন বাদশাহের প্রসন্ন কপালটিতেও কি সেদিন কয়টি কুটিল রেখা ফুটে ওঠেনি? খোজাও ভালবাসে, ভালবাসতে পারে—তথ্য হিসাবে এটি সেদিন তাঁর কাছেও কি চাঞ্চল্যকর নয়?

তাই বলছিলাম, হারেম শুধু অগণিত দীর্ঘশ্বাসে ঠাসা অভিশপ্ত পুরী নয়—সেখানে অনেক সুলতান বাদশাহের দীর্ঘশ্বাসও একসঙ্গে মিশে আছে।

॥ একটি রাজধানী-বদলের কাহিনী ॥

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রাজার ইচ্ছায় রাজধানী। রাজধানী-বদল, অতএব ইতিহাসে সব সময় উল্লেখযোগ্য খবর নয়। শহুরে ভাড়াটের ঠিকানা-বদলের মত শোখিন রাজারা হামেশাই তা করেছেন। রোম থেকে কনস্টানটিনোপল, মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ, দিল্লি থেকে ফতেপুরসিক্রি-আগ্রা, কিংবা প্যারিস থেকে ভার্সাই—ইতিহাসের পাতায় নয়া নয়া রানী আর নব নব রাজধানীর অনেক খবর। এমন কি হঠাৎ রাতভোরে দিল্লি থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি যাত্রার ফরমানও অজ্ঞাত নয়। বাদশা যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর সব হুকুমই শিরোধার্য। কলকাতা থেকে দিল্লি—তবুও ইতিহাসে একটি চাঞ্চল্যকর উপাখ্যান। কেননা, রাজধানী বদলের এই কাহিনী আর্থার বা ক্যানিউট-এর আমলের গল্প নয়, সেদিনের ঘটনা। তাছাড়া ঘোষণাটি যদিও 'হিজ মোস্ট একসেলেণ্ট ম্যাজেস্টি জর্জ দি ফিফথ বাই দি গ্রেস অব গড কিং অব দি ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়র্ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড অব দি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ, ডিফেণ্ডার অব ফেথ, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া'-র মুখ থেকে নির্গত, তাহলেও দেশময় সেদিন উত্তেজনা; কারণ দেশে শুধু রাজা নয়, প্রজাও ছিল। মহম্মদ তুঘলকের আমলের নম্র-বশ্য প্রজা নয়, বিশ শতকের দুর্বিনীত মানুষ। তারা কথা বলতে জানত।

বিশ শতকে রাজধানী-বদল চলতি লোকাচার অনুযায়ী একেবারেই অসিদ্ধ, কিংবা প্রজামুখে দুষ্কর্ম হিসেবে গণ্য এমন নয়। নানকিং থেকে পিকিং, কিংবা করাচী থেকে ইসলামাবাদ একালেও অবশ্যই সম্ভব। জনতার সম্মতি আদায় করতে জানলে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লির সিদ্ধান্তটি সে সড়ক ধরে এগোয়নি। সে যেন লালদিঘি পারে হঠাৎ ভূমিকম্প, কলকাতার মাথায় আচমকা বজ্রপাত।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। ১৯১১ সন। ভূ-ভারতময় তুমুল উত্তেজনা, আলোড়ন। দিল্লিতে রাজকীয় দরবার বসেছে। সাগর পার থেকে ভারত সম্রাট স্বয়ং পঞ্চম জর্জ এসে দেওয়ান-ই-খাস বসিয়েছেন দিল্লিতে। সঙ্গে রানী মেরী। ভারতের যেখানে যত রাজা-মহারাজা ছিলেন রং বেরংয়ের পোশাক পরে সবাই সেখানে হাজির। গোঁফ-দাড়ি, পাগড়ি, তলোয়ার আর জমকালো পোশাকের সে এক আশ্চর্য প্রদর্শনী! সমবেত চার হাজার মানুষের প্রত্যেকেই যেন এক স্বতন্ত্র পৃথিবীর আগন্তুক, প্রত্যেকেই দর্শনীয়। ফাঁকে ফাঁকে শোভাযাত্রা, ব্যাণ্ড-বাদ্য, তোপধ্বনি, আর 'গড সেভ দি কিং'। ভারতের তামাম বড়মানুষের মন দিল্লিতে। ডিসেম্বরের শীতেও দিল্লি সেবার রীতিমত গরম।

সেদিন ১১ই ডিসেম্বর, সোমবার। দরবারের শেষ দিন। অতিথিরা ক্লান্ত। দেখে দেখে আর শুনে শুনে চোখ কান অবসন্ন। তবুও শিষ্টাচারে ত্রুটি থাকা সঙ্গত নয়। বিশেষ দান খয়রাত, খেলাত-ইত্যাদির ফর্দটি শেষ দিনই ঘোষিত হওয়ার কথা। উৎকর্ণ শ্রোতার দল তারই অপেক্ষায়। টুকিটুকি অনুষ্ঠান শেষে সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত এল, মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন গভর্নর জেনারেল। মহামান্য সম্রাটের নামে তিনি দু' হাতে ফিতে-মেডেল, সর্দার-বাহাদুর রায়-বাহাদুর খান-বাহাদুর ইত্যাদি ছড়ালেন। কারও দেনা মকুব হল, কেউ নতুন তালুক উপরি পেলেন, কেউ বা অন্য কিছু। দীর্ঘ তালিকা। পাঠ শেষে লাটবাহাদুর আপন আসনে ফিরলেন। আবার তোপধ্বনি, বাদ্য। হেরাল্ড সম্রাটের নামে তিনবার জয়ধ্বনি তুললেন। অ্যাম্ফিথিয়েটার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। এবার সহকারী হেরাল্ড-এর পালা। তিনি ধ্বনি তুললেন রানীর নামে। এবারও দরবারের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি তরঙ্গায়িত জয়ধ্বনি। রাজদম্পতি সিংহাসন থেকে উঠে শোভাযাত্রা সহকারে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। পরক্ষণেই আবার ফিরে এলেন। হেরাল্ড নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। আবার গীত-বাদ্য। রকম দেখে দর্শকদের মনে হল—সভা ভঙ্গের সময় সমাগত। এবার সম্রাট উঠে দাঁড়ালেই তাঁদেরও ছুটি। ক' মিনিট পরে সম্রাট সত্যিই উঠে

দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে রানী মেরীও। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন না। হাত বাড়িয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে একখানা কাগজ নিয়ে ধীর স্বরে পড়তে লাগলেন :

We are pleased to announce to our people that on the advice of our Ministers, tendered after consultation with our Governor General in Council, we have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from Calcutta to the ancient capital of Delhi…

অর্থাৎ, আমরা স্থির করেছি অতঃপর ভারতের রাজধানী হবে কলকাতা নয়—দিল্লি! সেই সঙ্গে মহামান্য ভারত সম্রাট আরও ঘোষণা করলেন—অচিরেই বাংলা প্রেসিডেন্সীর জন্য একজন গভর্নর-এর ব্যবস্থা করা হবে, নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিহার, ছোটনাগপুর এবং ওড়িষা একজন লেঃ গভর্নরের অধীন হবে এবং আসাম শাসন করবেন একজন চীফ কমিশনার। অর্থাৎ ক' বছর আগে কার্জন মানচিত্রে যেসব আঁকিবুকি করেছিলেন, তাও তামাদি হয়ে গেল। যুগপৎ যুগল চাঞ্চল্য। শ্রোতারা পুরো মর্ম বুঝতে না বুঝতেই মাস্টার অব দি সেরিমনিজ এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন—দরবার ভঙ্গ হল! রাজদম্পতি শোভাযাত্রা সহকারে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। হাতে হাতে মুদ্রিত রাজকীয় ঘোষণা বিতরিত হল। গেজেট এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্রও প্রকাশিত হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মধ্যে সব শেষ। দরবার বিস্মিত, চমকিত! প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের ভাষায়—যেন বম্বশেল!

একই চমক কলকাতায়। পরের দিন কাগজ খুলে রাজধানী কলকাতা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। কী করে এমন ঘটনা সম্ভব! এত বড় শহর, হাজার হাজার রাজকর্মচারী, রীতিমত বড় কাউন্সিল! তাছাড়া, লাট ভবনে নিত্য আনাগোনা, অথচ কাকপক্ষীটিও জানতে পারল না—এমন মন্ত্রগুপ্তি এ যুগে কী করে সম্ভব হল! তবুও অবিশ্বাসের উপায় নেই। সামনেই মুদ্রিত রাজকীয় ঘোষণা। যেন বাচ্চা

ছেলের হাতের বেলুনটি ক্রীড়াচ্ছলে কেউ হঠাৎ আলপিনে ফুটো করে দিল। শহর কলকাতা বিমূঢ় বিস্মিত, ক্রুদ্ধ। দু'শ বছরের গৌরব, এই সাজানো ট্যাঙ্কস্কোয়ার, এই ক্লাইভ স্ট্রীট, রাজভবন—নিমেষে সব তছনছ হয়ে গেল! চোখ ঠেলে জল আসে, অথচ কান্নার উপায় নেই। সামনেই রাজকীয় অতিথিদের আগমন দিন, শহরে তার প্রস্তুতি চলছে। কলকাতা ভেবে পাচ্ছে না এই অবিচারের প্রতিকার কী!

পরের দিন খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হল গভর্নর জেনারেল আর হোম সেক্রেটারীর নোট। জানা গেল, এই ষড়যন্ত্রে আসল যন্ত্রী কে! তিনি আর কেউ নন, গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। আগস্টের ২৫ তারিখে বিলাতে হোম সেক্রেটারীর কাছে এই সর্বনাশা প্রস্তাব নিবেদন করে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। ষড়যন্ত্রের সেটিই সূত্রপাত।

দীর্ঘ নোট। তাতে নানা যুক্তি তর্ক। তার সার কথা রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরালে সকলের মঙ্গল। কেননা, কলকাতা তথা ফোর্ট উইলিয়াম যে পরিস্থিতিতে ভারতে ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল, সে পরিস্থিতি আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। রাজ্য এখন বিশাল সাম্রাজ্য। রেলপথ স্থাপিত হয়েছে, এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অনেক পাল্টে গেছে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের আকার ক্রমেই বড় হচ্ছে। নানা প্রান্তের সদস্যদের পক্ষে কলকাতা যাতায়াত রীতিমত কঠিন সমস্যা। তাঁদের নিয়ে সভা করা আরও কঠিন। পুরোনো কাউন্সিল হাউসে জায়গা কম। নতুন একটি গড়া হচ্ছে, সেটি সম্পুর্ণ হলে রাজধানী হিসেবে কলকাতার দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠবে। এর পর আরও কয়েকটি যুক্তি আছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালীরা উত্তেজিত, এখানে প্রতিবাদ আন্দোলন ইত্যাদি লেগেই আছে। দেশ শাসনের পক্ষে রাজধানীতে এত হট্টগোল অসুবিধাজনক। কলকাতার আর একটি অসুবিধা এখানকার আবহাওয়া। এখানে গ্রীষ্ম নিদারুণ। বছরে বেশ কয়েক মাস রাজধানী সরিয়ে নিতে হয় সিমলায়। তাতে অনেক খরচ।

অতএব তাঁর কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে গভর্নর জেনারেল প্রস্তাব করলেন রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হোক। দিল্লির পক্ষে বিস্তর সওয়াল করেছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর নোটে। দিল্লির আবহাওয়া বছরে সাত মাসই চমৎকার। ১লা অক্টোবর থেকে ১লা মে অনায়াসে সেখানে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায়। দিল্লি সিমলা থেকে কাছে। দফতরের সিমলা মরসুমী অভিযান তা-ই অপেক্ষাকৃত সহজে এবং কম খরচে সম্ভব হবে। দিল্লি মোটামুটি ভারতের কেন্দ্রস্থলে। সুতরাং, রেল, ডাক, তার ইত্যাদি বিভাগগুলোর সমৃদ্ধি ঘটবে। বাণিজ্য দফতরেরও লোকসান হবে না। এতকাল কলকাতা তার কাছ থেকে যেসব সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তখন বোম্বাই করাচীও তা পাবে। ফলে সমগ্র ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। তাছাড়া দিল্লি একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র। রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হলে হিন্দুরা খুশি হবে। মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ওখানেই হয়েছিল। পুরানো-কেল্লার জমিতেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। দিল্লিকে রাজধানা হিসেবে পেলে মুসলমানেরাও যারপরনাই আনন্দিত হবে। দিল্লি মুসলিম গৌরবের নানা স্মৃতিবিজড়িত। সুতরাং হুকুম দিন, চলো দিল্লি!

যুগপৎ পূর্ব ভারতে শাসনতান্ত্রিক নব বিন্যাসেরও বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করলেন হার্ডিঞ্জ। তাঁর মতলব চতুর্বিধ। (১) শাসনকাজের সুবিধা (২) বাঙালীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার মীমাংসা, (৩) পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং মুসলিম জনসাধারণের পরিতোষসাধন, এবং (৪) যাবতীয় আন্দোলনের স্থায়ী উপসংহার। এর জন্য কার্জনকে বানচাল করে হার্ডিঞ্জ প্রস্তাব দিলেন—(ক) প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান, ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বঙ্গভাষী অঞ্চলকে আবার এক করে একজন সপরিষদ গভর্নরের অধীন করা হোক ; (খ) বিহার ছোটনাগপুরে এবং ওড়িষাকে একসঙ্গে একজন লেঃ গভর্নরের শাসনাধীনে আনা হোক ; এবং (গ) আসামে আবার চীফ কমিশনারের শাসন প্রবর্তিত হোক। প্রতিটি ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধার কথাও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হার্ডিঞ্জ। তাঁর এই নোটটি রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক দলিল হিসেবে

একটি পড়বার মত কাগজ। সেদিনের ইংরেজ শাসকের মন কত বাঁকাচোরা পথে ফিরত, প্রতি অধ্যায়ে ইঙ্গিত রয়েছে তার।

খুঁটিনাটি যাবতীয় আলোচনার মধ্যেই হার্ডিঞ্জ একসময় নিবেদন করলেন—সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগামী দরবারে সম্রাট স্বয়ং এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি ভারতের কর্ণগোচর করেন!

হোম সেক্রেটারী তখন লর্ড ক্রু। তিনি উত্তর দিলেন ১লা নভেম্বর। প্রায় সমান মাপের দীর্ঘ উত্তর। তার সার কথা: আমি তোমার সঙ্গে এক মত। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মহামান্য সম্রাট নিজেই যথাসময়ে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তার ক'সপ্তাহ পরে হঠাৎ ১১ই ডিসেম্বর রাজকীয় ঘোষণা। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল রাজধানী কলকাতা!

'—হার্ডিঞ্জ মাস্ট গো!' দাবি জানাল কলকাতার একটি কাগজ। ১৪ই ডিসেম্বর 'ইংলিশম্যান' লিখল: এই ঘোষণার ফলে দরবারের মহিমা এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই কমে গেল। যদিও ঘোষণাটি রাজমুখে উচ্চারিত, তা হলেও আমরা এই অন্যায়ের সমালোচনা না করে পারছি না।

('...this cannot prevent us again questioning its wisdom and criticising with some severity the altogether inadequate excuses which have been put forward to justify it.')

'স্টেটসম্যান' আরও কড়া সমালোচক। সে খোলাখুলি আক্রমণ করল গভর্নর জেনারেলকে (১৪ই ডিসেম্বর); ভারত সরকার নিঃসন্দেহে আমাদের বিস্মিত করতে সমর্থ হয়েছেন। দু' দিন আগেও গোটা ভারতে এক ডজন লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ, যাঁরা জানতেন কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সত্যিই স্থানান্তরিত হতে চলেছে! লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর উচ্চপদটিকে দুষ্কার্যে লাগিয়েছেন, রাজাকে তিনি ভুল বুঝিয়েছেন। এবং তার ফলে যে জনপ্রিয়হীনতা আসলে তাঁর-ই প্রাপ্য তা তিনি মহামান্য সম্রাটের মাথায় চাপিয়েছেন। সুতরাং আমাদের দাবি রাজধানী সম্পর্কে

শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, তার জন্য দায়ি ব্যক্তিটিকে বিতাড়িত করা হোক।

('...the man who is responsible for thus abusing the authority of the Sovereign should seek some other sphere of influence.')

দিনের পর দিন কাগজে কাগজে ধ্বনিত হয়ে চলল প্রতিবাদ। কলমের পর কলম বিস্তীর্ণ চিঠি ছাপা হতে লাগল। ফাঁকে ফাঁকে সম্পাদকীয়, কবিতা, বিশেষ প্রবন্ধ, ব্যঙ্গচিত্র। 'ইংলিশম্যান'-এ পদ্য বের হল—

> Why are the people shouting ?
> What is the news today ?
> Leaving the Ditch for Delhi !
> Marching ! Marching away !

ব্যঙ্গচিত্রে দেখা গেল শূন্য গভর্নর হাউস-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিন্ন-বসন কলকাতা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাশে প্ল্যাকার্ডে লেখা—খালি-কুঠি, যে কোন ভাড়াটিয়া চাই। কাগজে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রবন্ধের শিরোনামা—'দিল্লি, ইটস ড্র ব্যাক অ্যাজ ক্যাপিট্যাল অব ইণ্ডিয়া !' কলকাতার হতাশা এবং ক্রোধ আর গোপন নেই।

একই উত্তেজনা সাগরের ওপারেও। ১২ই ডিসেম্বর কমনস সভা খবর পেল। সেদিন-ই লর্ডদের সভাও। প্রধানমন্ত্রী তখন অ্যাসকুইথ। তাঁর মুখে খবর শুনে কমনস হতভম্ব।—এমন গুরুতর খবরটির বিন্দুমাত্র আভাসও পাননি তাঁরা! লর্ডস সভায় লর্ড ল্যান্সডাউন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন—এমন গুরুতর সংবাদ বোধহয় এই সভা আগে কখনও শোনেনি। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের অর্থ অনেক ঐতিহ্যের উৎপাটন। প্রস্তাবিত পরিবর্তন শুধু আকস্মিক নয়, জবরদস্তিমূলক। ঘটনাটা আরও গুরুতর, কারণ স্বয়ং সম্রাটকে জড়িত করা হয়েছে এই অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তের সঙ্গে। লর্ড

কার্জনও উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সম্রাটের ভারত ভ্রমণ এখনও শেষ হয়নি—সুতরাং তিনি সেদিনের মত বিশেষ কিছু বললেন না।

কিন্তু বিলাতী কাগজগুলো মৌনব্রতে রাজি হল না। এদেশের কিছু কিছু কাগজের মত (যথা লাহোরের 'সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট', এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' ইত্যাদি) 'টাইমস' এবং 'ডেইলি মেল' সিদ্ধান্তটিকে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু অন্যান্য কাগজ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' লিখল—এমন গায়ের জোরি ব্যাপার বোধহয় রাশিয়াতেও সম্ভব নয়!

কলকাতা এবং লণ্ডনের অসংখ্য কাগজ তুমুল কোলাহল করেছিল। ল্যান্সডাউন, কার্জন, মিণ্টো—তিন তিনজন ভূতপূর্ব কলকাতার ইজ্জত রক্ষার্থে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। বাংলা দেশের ইঙ্গবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একযোগে আন্দোলন করেছিলেন। পরবর্তী দিনে গান্ধীজীসহ অনেক জাতীয় নেতাও। কিন্তু হার্ডিঞ্জকে তবুও ঠেকান গেল না। দরবারের তে-রাত্তির পার হতে না হতেই তিনি রাজদম্পতির হাতে নয়াদিল্লির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়ে নিলেন।

দরবার মঞ্চের কাছেই তাড়াহুড়া করে একটি জায়গা ঠিক করা হল। বেলা দশটায় রাজ-দম্পতি সেখানে এসে পৌঁছলেন। ত্বরিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। হার্ডিঞ্জ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন: দিল্লি এবং তার চারপাশের অঞ্চলে অনেক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোনটি এমন অতীতে যে, তার ইতিবৃত্ত আজ লোকেরা ভুলে গেছে। কিন্তু মহামান্য সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী, আপনারা যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে চলেছেন দিল্লির ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। হার্ডিঞ্জ আরও জানালেন, তিনি কথা দিতে পারেন, আজ যে রাজধানীর ভিত্তি স্থাপিত হবে এমন দীর্ঘস্থায়ী রাজধানী দিল্লি আর কখনও দেখেনি। এমন গৌরবের রাজধানীও এতদ্দেশে এই প্রথম…ইত্যাদি।

সম্রাট উত্তরে বললেন—আমি এবং রানী আমরা উভয়েই আজ প্রীত।—

'—May God's blessings rest upon the work which is so happily inaugurated to-day.'

অভিভাষণ শেষে সম্রাট ধীর পায়ে ভিত্তিপ্রস্তরটির দিকে এগিয়ে গেলেন। সরকারী এঞ্জিনীয়ার-প্রধান তাঁর হাতে কর্নিক তুলে দিলেন। যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে ভারতেশ্বর নয়াদিল্লির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। পূবের পাথরটি স্থাপন করলেন তিনি নিজে, পশ্চিমেরটি রানী। হেরাল্ড মঞ্চে উঠে ঘোষণা করলেন: মহামান্য রাজার আদেশে আমি জানাচ্ছি, রাজধানীর প্রস্তর উত্তমরূপে, যথোপযুক্তভাবে স্থাপিত হয়েছে। তাঁর সহকারী উর্দুতে এক-ই সংবাদ ঘোষণা করলেন। ধ্বনি উঠল—পুরানো রাজধানী আবার নতুন হল!—সম্রাটের জয়! সেদিন ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১১ সন। হার্ডিঞ্জ বিজয়ীর হাসি হাসলেন।

চারদিকে রটে গেল—লাটবাহাদুর সমূহ অমঙ্গল ডেকে আনছেন। কাছেভিতে পাথর না পেয়ে নতুন রাজধানীর ভিত্তির জন্য তিনি পাথর সংগ্রহ করেছেন পুরনো এক কবর থেকে। এমনিতেই দিল্লি বদনামী শহর। দিল্লি নাকি সাম্রাজ্যের কবর। একের পর এক প্রায় পনেরটি সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল এই নগর। কিন্তু কোনটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি।—এমন অশুভ জমিতে কেন ইংরেজের রাজধানী বসালেন হার্ডিঞ্জ? কাগজে কাগজে আবার সমালোচনার ঢেউ। তার ওপর পাথর ঘিরে এই গুজব! কমনস সভায় মার্কিস অব জেটল্যাণ্ড-এর মুখেও শোনা গেল এক-ই অভিযোগ।—শুভ অনুষ্ঠানে কবরের পাথর দেওয়া হল কেন? —গায়ে পড়ে, সব জেনেশুনে কেন এ-ভাবে অমঙ্গল ডেকে আনা? ১৮৫৭র পরে ইংরেজরা যে কোন গুজব বিষয়েই অতি সতর্ক!

কিন্তু এত কাণ্ড সত্ত্বেও কলকাতার রাজধানী-গৌরবকে বাঁচাতে পারলেন না কেউ। কেননা, রাজকীয় সিদ্ধান্ত। রাজার কথা হাতির দাঁতের মত, তার নড়ন-চড়ন নেই! হার্ডিঞ্জ সেটা জানতেন। আর তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি এই অভাবিত পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

মতলবটি অভিনব নয়, অভিনব তা সিদ্ধ করার কৌশলটি। সুদূর

১৮৬৪ সন থেকেই কলকাতা থেকে রাজধানী বদলের গুঞ্জন শোনা গেছে। লর্ড লরেন্স একবার সে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। শোনা যায়, কার্জনও চেয়েছিলেন কলকাতার বদলে রাজধানী করেন আগ্রা। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি জনসমক্ষে পেশ করতে ভরসা পাননি। শুধু আগ্রা নয়, কলকাতার বদলে নানা সময়ে আরও নানা জায়গার নাম শোনা গিয়েছে, কিন্তু কোন শহরই কলকাতাকে জব্দ করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, প্রতিবারই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রকাশ্যে। কলকাতার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী মহল প্রতিবারই লড়াই করেছেন প্রাণপণ। তাঁদের চেঁচামেচি, হৈ হল্লায় সাধ্য কার কলকাতা থেকে রাজধানী সরান! হার্ডিঞ্জ সে সব খবর জানতেন। তিনি জানতেন খবরটা একবার ফাঁস হয়ে গেলে কিছুতেই এমন দুরূহ পরিকল্পনা সফল হবে না। সুতরাং, তিনি বাঁকা পথ ধরলেন। এমন পথ যা অপ্রত্যাশিত, কলকাতার স্বপ্নেরও অগোচর।

এক কথায় বলা চলে—সে এক অবিশ্বাস্য রাজকীয় 'ক্য দেতা'! এবং সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব একজন মানুষের। তিনি হার্ডিঞ্জ। মাত্র এক বছর আগে (ডিসেম্বর, ১৯১০) ভারতে অবতরণ করেছেন নতুন গভর্নর জেনারেল। কিন্তু কূটনীতিতে তিনি পুরনো রাজকর্মচারী, এর আগে সে কাজে হাত পাকিয়ে এসেছেন। সুতরাং, প্রথম থেকেই অতি সংগোপনে শুরু হল তাঁর কাজ। এ-টি গোপন নোটে লাটসাহেব একদিন কাউন্সিলকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। বাইরে কেউ কিছু জানে না। সুতরাং কোন মহল কোন চাপ সৃষ্টির সুযোগ পেল না। কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের প্রস্তাবে সায় দিলেন। হার্ডিঞ্জ এবার বসলেন বিলাতে চিঠি লিখতে। পরবর্তী কালে নিজের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন—এ সম্পর্কে নিজের চিঠি আমি নিজেই লিখতাম। কাউন্সিল মেম্বারদের নোট ইত্যাদি টাইপ করান হত অতি সংগোপনে। হোম সেক্রেটারীকেও আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম—কেউ যেন বিন্দুমাত্র টের না পায়। আমার প্রস্তাব গৃহীত হোক বা না হোক, কেউ যেন কিছুই জানতে না পারে।

হোম সেক্রেটারি লর্ড ক্রু তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

একদা তিনি নিজেই কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার জন্য দরবার করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার প্রতিরোধের ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার আর তিনি এ সুযোগ নষ্ট করতে রাজি হলেন না। গোপনীয়তায় তিনি হার্ডিঞ্জকেও পিছনে ফেললেন। দুঃসাহসীর মত তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছেও কলকাতার চিঠিটি চেপে গেলেন। লর্ড অ্যাসকুইথ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলেন রাজার কাছ থেকে সম্মতি পাওয়ার পরেই! আইনত সেটা অসিদ্ধ নয়, কিন্তু যে কোন ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারির পক্ষে অবশ্যই এটা সাহসিকতার কাজ।

আরও গোপনীয়তা দেখালেন রাজা পঞ্চম জর্জ। লর্ড হার্ডিঞ্জ লিখছেন: রাজদম্পতির ভারত আগমনের দিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম রানী নিজেও রাজধানী বদলের খবরটি জানেন না। একটা গোপন সভায় রাজাকে কথাটা বলতে গিয়ে চমকে উঠলাম।—তবে কি রানীও জানেন না। পঞ্চম জর্জ ইঙ্গিতে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা-ই। হার্ডিঞ্জের আনন্দ আর ধরে না। তবে বোধহয় এবার তাঁর স্বপ্ন সত্যিই সফল হল!

আনন্দ যত, উদ্বেগ তার চেয়েও বেশি। দরবারের আর ক'দিন মাত্র বাকি। এ যাবৎ যা হয়েছে, সব-ই দায়িত্বশীল জনা কয়েক মানুষের মধ্যে। এবার সিদ্ধান্তটিকে কার্যকর করতে হলে আরও কিছু করণীয় আছে। ঘোষণাপত্র, গেজেট এবং আনুষঙ্গিক সরকারী কাগজপত্রে খসড়া করতে হবে, ছাপাতে হবে। যে কোন মুহূর্তে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাহলে বিপত্তি। রাজা অসন্তুষ্ট হবেন, মতলবটিও হাসিল হবে না। হার্ডিঞ্জ ভাবিত।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত একটা উপায় মাথায় এল। হার্ডিঞ্জ নিঃশব্দে আবার কাজ শুরু করলেন। দরবারের ক্যাম্পের ভেতরে তিনি আর একটি স্বতন্ত্র ছোট্ট ক্যাম্প বসালেন। তাঁর নির্দেশে সেখানে ছাপাখানা বসান হল। সেই সঙ্গে হেঁসেল এবং শোয়ার তাঁবু। ৮ই ডিসেম্বর দরবারের উদ্বোধন। তার তিন দিন আগে সেই গোপন-ক্যাম্পে

সেক্রেটারি এবং মুদ্রাকরদের ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সকলের চোখের আড়ালে তাঁরা নির্দিষ্ট কাজ করে চললেন। ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে সৈন্য বাহিনীর কড়া পাহারা। তারপরে আবার একটি পুলিস বেষ্টনী। কারও সাধ্য নেই যে তার ভেতরে ঢোকেন কিংবা বেরিয়ে আসেন। অনেকটা পরবর্তী কালের বাজেট ছাপাবার কৌশল।

বাজেট তবুও সতর্কতা সত্ত্বেও কখনও কখনও ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র নিঃশ্ছিদ্র। সম্রাটের ঘোষণা পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরবারে পৌঁছল শীলমোহর করা গেজেটের বাণ্ডিল। কাণ্ড দেখে বিরাট বিরাট রাজপুরুষেরাও স্তম্ভিত। একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রত্যেকের মুখে জিজ্ঞাসা—তুমি কি জানতে? ভারত এবং ব্রিটেনে এক ডজন মানুষও মাথা নাড়িয়ে বলতে পারেননি—হ্যাঁ, জানতাম। মাত্র জনাকয় মানুষ আর একটি নির্ভুল চাল—নিমেষে দু'শ বছরের পুরনো রাজধানী বাতিল হয়ে গেল। দিকে দিকে ধ্বনি উঠল —চলো দিল্লি!

নতুন শহর গড়ার ভার পড়েছিল বিখ্যাত স্থপতি এডুইন লিউটেনস-এর ওপর। পরের ব[illegible]র গ্রীষ্মে এসে তিনি নামলেন নয়া রাজধানীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। সব দেখে শুনে স্থপতি রায় দিলেন ভুল জায়গা পছন্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভার্সাই গড়তে হলে আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে সরে না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং আবার ছোটখাটো একটি ষড়যন্ত্র। গোপনে রাতের অন্ধকারে অনেক কৌশল করে আদি ভিত থেকে টেনে তোলা হল সেই পাথরযুগল। তারপর গরুর গাড়ি করে নিশুতি রাতেই সেগুলো বয়ে নিয়ে আসা হল সে-ই বিন্দুটি থেকে অন্তত দশ মাইল দক্ষিণে। নিঃশব্দে আবার মাটিতে বসান হল রাজকীয় স্মৃতিচিহ্ন! তারপর শুরু হল নতুন শহর গড়ার কাজ।

এত করেও কি নয়াদিল্লি ইংরেজ রাজধানী হিসেবে সফল হয়েছিল? অনেক ইংরেজই আপত্তি করবেন। অন্তত একজন অবশ্যই। তিনি সুখ্যাত পার্কিনসন। পার্কিনসন সাহেব বলেন—ইতিহাসে দেখা গেছে ঝোঁক

যখন বাড়ির দিকে শাসনের মান তখন নীচের দিকে। নমুনা—নয়াদিল্লী। "নতুন রাজধানীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক বিপর্যয়।··· ১৯১২ সনে ভাইসরয়ের (হার্ডিঞ্জ) প্রাণনাশের চেষ্টা, ১৯১৭ সনের ঘোষণা, ১৯১৮ সনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট এবং ১৯২০ সনে তা কার্যকর হল। লর্ড আরউইন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নতুন প্রাসাদে গিয়ে উঠলেন ১৯২৯ সনে। সে বছরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুখে পূর্ণ স্বাধীনতায় দাবি, সে বছরই গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন। তার পরের বছর আইন অমান্য আন্দোলন! পার্কিনসন বলেন—একটু পরিশ্রম করলেই দেখানো যায় একদিকে নতুন রাজধানীতে এক একটি বাড়ি হচ্ছে অন্যদিকে ইংরেজের ভারত ত্যাগের সময় এগিয়ে আসছে।—

What was finally achieved was no more and no less than mausoleum.

হার্ডিঞ্জ নিশ্চয়ই তার জন্য এত কানাকানি ফিসফাস, এমন উদ্যোগ আয়োজন করেননি!